The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 34, 2024 (P. 164-199)

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসন (১৭৩৭-১৮৮৫): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আনন্দ বিকাশ চাকমা[১]

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো চাকমা। বর্তমানে চাকমাদের মূল আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চাকমা সার্কেল চিফ অফিস বা রাজকার্যালয়ও রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত। চাকমা ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় আঠারো-উনিশ শতকে তারা চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়ায় বসবাস করত এবং শুকবিলাস ও রাজানগর ছিল তাদের প্রসিদ্ধ রাজধানী। রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থানকালে তারা ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। দীর্ঘ এক দশক ধরে সংঘর্ষ চলার পর উভয়পক্ষ সমঝোতায় উপনীত হয়। অতঃপর চাকমা শাসিত রাঙ্গুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হলে চাকমা শাসকরা স্বীয় রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। চাকমা রাজসরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হতে থাকে নতুন নগর, অফিস-আদালত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচলন হয় নতুনধারার মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠান। এভাবে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের স্বশাসনের বুনিয়াদ রচিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সরকার যখন চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলসমূহ নিয়ে চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস নামে পৃথক জেলা গঠন করে প্রত্যক্ষ শাসননীতি গ্রহণ করে তখন সে-নীতির প্রভাব পড়ে চাকমা শাসন ও সমাজব্যবস্থায়। ব্রিটিশ সরকারের চাপের মুখে রাঙ্গুনিয়ার শেষ চাকমা রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর রাজানগর ছেড়ে কর্ণফুলীর তীরে রাঙ্গামাটিতে নতুন রাজ্যপাট স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। সাধারণ চাকমারাও রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ফলশ্রুতিতে একসময়ের জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানী রাজানগর পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থানকালে চাকমা রাজপ্রশাসনের কাঠামো সুবিন্যস্ত হয়। চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদও রচিত হয়। চাকমা সমাজে নতুন প্রথা, পদ-পদবী ও উপাধিগুলোর প্রচলন ও প্রয়োগ শুরু হয় রাঙ্গুনিয়া পর্বে। তাই চাকমা জাতিসত্তার বিবর্তনধারায় রাঙ্গুনিয়া পর্বটি গভীর তাৎপর্যবহ। বর্তমানে রাঙ্গুনিয়ায় শুধু কয়েক পরিবার চাকমার বসবাস হলেও চাকমা রাজাদের এস্টেট বা ভূ-সম্পত্তি এখনো আছে। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী চাকমা শাসনের সাক্ষী হিসেবে এখনো দৃশ্যমান আছে ঐতিহ্যবাহী রাজানগর রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধবিহার, কাছারি ঘর, মন্দির, মসজিদ ও পুকুর প্রভৃতি যেগুলো রাঙ্গুনিয়াকে একটি ঐতিহাসিক ও প্রাণবন্ত নগরীতে পরিণত করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ***গবেষণাধীন এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং আর্কাইভ্‌সে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র, সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ১৭৩৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে।***

চাবি/সূচক শব্দ: রাঙ্গুনিয়া, চাকমা শাসন, চাকমা ঐতিহ্য, রানি কালিন্দী, রাজসরকার, বৌদ্ধমেলা

[১] অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। E-mail: abchakma_history@cu.ac.bd

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম চাকমা। ২০২২ সালে প্রকাশিত জনশুমারি হিসাব মতে বাংলাদেশে চাকমা জনসংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২৯৯ জন (*প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০২২)। দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে এ সংখ্যাটি বৃহত্তম। কিন্তু দেড়শত বছর আগে ১৮৭২ সালে প্রণীত পপুলেশন সেন্সাস অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় চাকমা জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২৮,০৯৭ জন। বিগত দেড়শত বছরে চাকমাদের জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। তারা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু 'দেশ' (ভারতের চাকমারা দেচ্‌কুল বলে) বলতে তারা প্রজন্মভেদে চাদিগাং বা হিল চাদিগাং অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ধারণ করে। দেশের সাথে জড়িয়ে আছে তাদের আবেগ ও স্মৃতি। এ পরিপ্রেক্ষিতে চাকমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশধারায় চট্টগ্রাম বিশেষ করে রাঙ্গুনিয়া পর্বটি খুবই তাৎপর্যবহ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণেতা ও প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টমাস হার্বাট লুইনের ১৮৬৯ সালে লিখিত গ্রন্থের দুটি লাইন থেকে চাকমাদের সাথে চট্টগ্রামের মানুষের নিবিড় সম্পর্কটি বুঝা যায়। তিনি লিখেছেন: 'The name of Chukma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District, and the largest and dominant section of the tribe recognizes this as its rightful appellation (Lewin,1869a, p. 62).' ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসকরা পার্বত্য অঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে নতুন জেলা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত চাকমারা চট্টগ্রাম জেলারই বাসিন্দা ছিল। তখন তাদের প্রধান বসতি ছিল উত্তর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল। আজ সেই রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর চাকমাদের ফেলে আসা এক অতীত ঐতিহ্যবাহী নগরী। আঠারো ও উনিশ শতকে রাঙ্গুনিয়া ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় অর্ধ-স্বাধীনতারূপ স্বশাসন ব্রিটিশাধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানি আমলের সূচনাপর্বে চাকমাদের রাঙ্গুনিয়াকেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের স্মারক। ঐতিহাসিক চাকমা বিদ্রোহের সুবাদে রাঙ্গুনিয়া, রনু খাঁ ও জান বক্স খাঁর নাম সরকারি নথিপত্রে বারংবার উল্লিখিত হয় এবং ব্যাপক প্রচার পায়। যেমন- ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ১১ অক্টোবর দায়িত্বরত কালেক্টর চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর এডওয়ার্ড এলেরকারকে লিখছেন: "The *Waddadar* having represented to me that he is about to send a *Sezawal* into the Ranganeah Provinces for the realizing of the Revenues in those Parts. I request you will give Instructions to the Party detached there to protect him from any Violences or Obstructions that may be offer'd to him from the People of Runno Cawn (Islam,1978, p.267)."

এছাড়া চাকমা রাজন্যবর্গ রাজকার্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা গড়েছেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন বিভিন্ন উৎসব ও মেলার। এসব কীর্তি ও ঐতিহ্যের কথা যেমন এখনও লোকমুখে শ্রুত হয় তেমনি এখনও দৃশ্যমান আছে বিভিন্ন নিদর্শন। যেমন রাজানগরে বিদ্যমান ধ্বংসপ্রাপ্ত চাকমা রাজবাড়ি, শাক্যমুণি বৌদ্ধবিহার, চাকমা রাজন্যবর্গের স্মৃতিবিজড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার তথা বাণিজ্যকেন্দ্র উত্তর-পূর্ব চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চলে চাকমাদের গৌরবময় শাসনাতিহ্যের ধারক। এসব কিছুর সমন্বয়ে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল। অথচ রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রসঙ্গটি একাডেমিক গবেষণায় অনেকটা অনালোচিত রয়ে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সম্পর্কে জানার উৎস হলো ব্রিটিশ প্রশাসকদের লিখিত কয়েকটি আকর গ্রন্থ। এঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লুইনের রচিত তিনটি গ্রন্থ (Lewin 1869a, 1870b, 1912c), উইলিয়াম হান্টারের প্রণীত *আ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল ভলিয়্যুম-৬(১৮৭৬)* এবং আর এইচ এস হাচিনসনের ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *অ্যান অ্যাকাউন্ট অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস* গ্রন্থসমূহ। কিন্তু এসব গ্রন্থগুলো থেকে উনিশ শতকের চাকমাদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ এথনোগ্রাফিক তথ্য পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের স্থানীয় ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মাহ্‌বুব-উল্ আলম, ওহীদুল আলম, আবদুল হক চৌধুরী, আহমদ শরীফ প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহে চাকমা প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ উল্লেখ করলেও রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। কিন্তু রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থানকালে চাকমারা শাসক হিসেবে যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমোন্নতি সাধন করেছিল সেসব আলোচনা সঙ্গতকারণেই এসব গ্রন্থে অনুপস্থিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে চাকমাদের মধ্যে কয়েকজন লেখকও চাকমাদের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল রাজবংশের ইতিবৃত্ত। আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে চাকমা রাজাদের শাসনব্যবস্থা, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব প্রসঙ্গে তারা আলোচনা করেননি। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মধ্যে চাকমা রাজা ও নৃগোষ্ঠীদের উপর প্রথম আলোকপাত করেন প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। তিনি চাকমা রাজাদের উদ্ভব এবং তাদের সঙ্গে মুঘল ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসকদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং আঠারো শতকের চাকমা ট্রাইব বিষয়ে দুটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। এ দুটি প্রবন্ধই মূলত আঠারো শতকের চাকমা রাজা ও চাকমা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু

মূল্যবান তথ্য দেয়। কিন্তু এর পরের শতক অর্থাৎ উনিশ শতকে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলোতে আলোকপাত করা হয়নি। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিষয়ক অপর খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ প্রফেসর সুনীতি ভূষণ কানুনগো চাকমাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম নিয়ে 'চাকমা রেজিস্টেন্স টু ব্রিটিশ ডোমিনেশন (১৭৭২-১৭৯৮)' শিরোনামে একটি ছোট কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আঠারো শতকে রাঙ্গুনিয়া চাকলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশদের রাজস্বনীতি, চাকমাদের ব্রিটিশাধিপত্য প্রতিরোধ সংগ্রামের কারণ, প্রকৃতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ের রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের প্রশাসনিক ক্রমবিকাশ, ধর্মীয় বিবর্তন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ তাঁর আলোচনার বহির্ভূত থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত পরের গবেষণাগুলোর বিষয়বস্তু মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, শান্তিচুক্তি ও আদিবাসী পরিচিতি নিয়ে বির্তককে উপজীব্য করে আবর্তিত। প্রফেসর আমেনা মহসিন, আদিত্য কুমার দেওয়ান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, নাসির উদ্দিন প্রমুখ এর গবেষণাগুলো এ ঘরানার। এসব গবেষণায় স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে চাকমাদের শাসনাতিহ্য প্রসঙ্গে আলোচনা ক্ষেত্রবিশেষে অনুপস্থিত ও অকিঞ্চিৎকর। অথচ ১৭৩৭ খ্রি. থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থানকালীন চাকমাদের ইতিহাস খুবই ঘটনাবহুল ও সমৃদ্ধ। সুতরাং চাকমা নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস সংক্রান্ত এ সুদীর্ঘ সময়ের অনালোচিত ঘটনাপ্রবাহের উপর সম্যক ধারণা লাভের জন্য আলোচ্য গবেষণাকর্মটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা জাতীয়ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নৃ-গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ জাতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে। ২৩ক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে: 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (বাংলাদেশ সংবিধান ২০১৬, পৃ. ৭)।' একই সাথে মূর্ত ঐতিহ্য সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে: 'বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (বাংলাদেশ সংবিধান, ২০১৬, পৃ. ৭)।' কিন্তু সংরক্ষণ বা উন্নয়ন সাধনের পূর্বে এসব আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোর উৎস ও অবস্থান চিহ্নিত করা ও তাদের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। ২০০৬ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত *জাতীয় সংস্কৃতি নীতি*,

২০০৬ এর জাতীয় সংস্কৃতির মূলনীতি অংশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৪ নং ধারায় উল্লেখ আছে, 'দেশে বসবাসকারী সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ২০০৬, পৃ. ৩)। নৃতাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিতে ক্রমে ক্রমে সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোর উৎস, অবস্থান, আদি-রূপ, বিকাশধারা বর্তমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা। চাকমারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। একটি ঐতিহাসিক কালপর্বে তাদেরও রাজ্য শাসনের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। সুতরাং চাকমা শাসনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা এখনো আছে।

৩. গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণার মূল জিজ্ঞাসা হলো আঠারো ও উনিশ শতকের রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের স্বরূপ অনুসন্ধান ও চাকমা জনগোষ্ঠীর বিবর্তনধারায় রাঙ্গুনিয়া পর্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ। গবেষণার মূল প্রশ্নটিকে সামনে রেখে কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন ধরে গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। যেমন- (ক) কখন ও কোন্ পটভূমিতে চাকমারা রাঙ্গুনিয়ায় আগমন ও বসতি স্থাপন করেছিল ? (খ) রাঙ্গুনিয়ায় কতজন চাকমা রাজা রাজত্ব করেন এবং তারা কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন? (গ) চাকমা রাজাদের শাসননীতি কেমন ছিল? (ঘ) চাকমা শাসন প্রসঙ্গে রাঙ্গুনিয়ার স্থানীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? (ঙ) অদ্যাবধি রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের কী কী ঐতিহ্য নিদর্শন আছে? (চ) রাঙ্গুনিয়ায় থাকাকালীন চাকমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? (ছ) চাকমা রাজন্যবর্গ কেন রাঙ্গুনিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন? এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি এবং সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথমে প্রাসঙ্গিক সেকেন্ডারি উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণার যৌক্তিকতা ও আঙ্গিক কাঠামো বিন্যস্ত করা হয়েছে। তারপর গবেষণা স্থান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে মাধ্যমিক বা দ্বৈতিয়িক উৎসে প্রাপ্ত তথ্য-বিবরণসমূহের যথার্থতা ও সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। অতঃপর ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের (রাজপ্রাসাদ, মহামুনি মন্দির, কাছারি দালান) স্থাপত্যরীতি ও নির্মাণশৈলীর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পেতে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া হয়েছে। চাকমা রাজাদের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে বর্তমান চাকমা রাজ কার্যালয়ে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক নথিপত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং বর্তমান চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। বৌদ্ধবিহারের কার্যক্রম ও ঐতিহাসিকতা বোঝার জন্য রাজানগর বিহার অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা

শাসনের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে স্থানীয়দের অভিব্যক্তি ও মূল্যায়ন পেতে রাঙ্গুনিয়ার প্রবীণ ব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা নিরূপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

৪. রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজবংশের আগমন ও জমিদারি প্রতিষ্ঠা

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের ইতিহাস চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাহ্‌বুব-উল আলম এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, 'চট্টগ্রামের অন্তবর্তী চাক্‌মা রাজ্য এবঙ পাশ্ববর্তী ত্রিপুরা আরাকান রাজ্য ছাড়াও সময় সময় গৌড়, সন্দ্বীপ, ভূলুয়া প্রভৃতি নিকটবর্তী রাজ্যের ইতিহাস চট্টগ্রামের ইতিহাসে তাহাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে (আলম, ১৯৬৫, পৃ. ১৭৪)।' তাঁর মতো চট্টগ্রামের প্রায় সকল আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক বিক্ষিপ্তভাবে চাকমাদের কথা উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস যেমন আরাকানের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত তেমনি চাকমা ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সাথে চট্টগ্রাম নাম বিশেষ করে রাঙ্গুনিয়ার নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। চট্টগ্রাম প্রাচীন আরাকান রাজ্যের অংশবিশেষ হিসেবেই ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে। চট্টলবিদ আব্দুল হক চৌধুরীর মতে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা ও মায়ানমারের আরাকান সুপ্রাচীনকাল থেকে একটি দেশরূপে পরিগণিত হতো (চৌধুরী, ১৯৮০, পৃ. ৫)। একসময় আরাকান ও চট্টগ্রাম একই রাজনৈতিক ভূখণ্ডভূক্ত ছিল (শরীফ, ২০১১, পৃ. ১৯-২০)। শুধু তাই নয় প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল বলে আরাকানের তখন নাম ছিল 'রোসাঙ' (আলম, ১৯৮২, পৃ. ৯)। চট্টগ্রামের স্থানীয় ইতিহাসবিদদের মতে, ৯৫৩ সালের আগে চট্টগ্রাম নামের অস্তিত্ব ছিল না। সে-বছর আরাকান রাজা সুলত-ইঙ্গ চন্দ্র নিজ রাজ্যাংশের এ ভূখণ্ডে বিদ্রোহী শাসককে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অতঃপর সেখানে বিজয়স্তম্ভ স্থাপনপূর্বক বর্মী ভাষায় একটি লিপি খোদাই করেন। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের কুমিরার নিকটে উক্ত শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয়। তাতে চিৎ-তৎ-গং (যুদ্ধ করা অনুচিত) শব্দের উল্লেখ থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি ঘটে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। পরে চিৎ-তৎ-গং বিকৃত হয়ে চাটগাঁও ও চট্টগ্রাম হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৮০, পৃ. ১)। চট্টগ্রাম বা তার অংশবিশেষ বহুবার বঙ্গের সুলতান, ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের করতলগত হয়েছে। কিন্তু আরাকান রাজ মেঙ ফালং কর্তৃক ১৫৮০ সালে চট্টগ্রাম জয়ের পর ১৬৬৬ সালে মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামে একটানা ৮৬ বছর আরাকানি শাসন বলবৎ ছিল। সন্দ থুধম্মই (১৬৫২-১৬৮৪) ছিলেন চট্টগ্রামে শেষ আরাকান রাজা (কানুনগো, ১৩৭৪, পৃ. ৮৭-৯২)। এ সুদীর্ঘ সময়ে চট্টগ্রাম ছিল আরাকানের উত্তর সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ।

চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যতীত প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বশাসিত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন, চক্রশালা, দেয়াঙ, রামু, চকরিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি। এর মধ্যে চাকমা অধ্যুষিত 'Chacomas' (চাকোমাস)ও একটি স্বশাসিত রাজ্য থাকা অসম্ভব নয়। রাঙ্গুনিয়া ছিল আরাকানি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র চক্রশালার সন্নিকটবর্তী এলাকা। সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীনকাল হইতে রাঙ্গুনিয়ায় মগ জাতি এবং পাহাড়ী লোকেরা বাস করিতেন। ... পূর্বে আরাকানী মগদের সহিত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্ণফুলী নদীর জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল (বড়ুয়া, ১৯৮৪, পৃ. ৭)। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেও কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে এক সময় চাকমা বসতি ছিল বলে প্রামাণ্য সূত্রে উল্লেখ আছে। Lorenz G. Loffler এর মতে, ষোল থেকে সতের শতকের মধ্যেই চাকমারা কর্ণফুলী নদী উপত্যকায় নিজেদেরকে পৃথক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল (Loffler, ১৯৬৪, পৃ. ৩৬)। পর্তুগিজদের অঙ্কিত একটি মানচিত্রে দেশবাচক 'চাকোমাস' শব্দের উল্লেখ কর্ণফুলী নদীর তীরে চাকমা জনপদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোয়াও ডি ব্যারস ১৫২৫ থেকে ১৫৩২ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইন্ডিয়া হাউজে কোষাধ্যক্ষ এবং ১৫৬৭ সাল পর্যন্ত ক্রাউন এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সময় বঙ্গোপসাগরের চতুর্দিকের রাজ্যগুলি নিয়ে 'ডেসক্রিপকাও-ডো-রেইনো-ডি- বেঙ্গালা' নামক একটি মানচিত্র আঁকেন। তাতে তিনি কর্ণফুলী নদীর অনতিদূরে 'Chacomas' (চাকোমাস) নামে একটি স্থানের নাম চিহ্নিত করেন (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৫০)। ব্যারোস তাঁর *কোয়ার্টা ডিকাডা এশিয়া* যার অর্থ ফোর্থ ডিকেড অব এশিয়া বা 'এশিয়ার চার দশক' শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে উক্ত মানচিত্রটি সযত্নে মুদ্রিত করেন। যদিও মানচিত্রটির তৈরির সময়কাল ছিল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ। এ মানচিত্র মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস ও চট্টগ্রাম-আরাকানের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য ঐতিহাসিকদের নিকট বিপুলভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ম্যাপ। সুতরাং এ মানচিত্রও চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আরাকানের পাশাপাশি কর্ণফুলী উপত্যকায় একটি চাকমা জনপদের অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করে। ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্যটি যে সে-সময় প্রভাবশালী আরাকান রাজশক্তির অধীনে ছিল সে-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ আরাকান রাজা মেং-রাজা-গ্রি ওরফে সেলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২) ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে এক পর্তুগিজ বণিককে লিখিত চিঠিতে নিজেকে 'The highest and the most powerful king of Arakan, of Chakmas and of Bengal' অর্থাৎ আরাকান, চাকমা ও বাংলার শীর্ষস্থানীয় এবং মহাপরাক্রমশালী রাজা বলে উল্লেখ করেছেন (Hosten, 1920, pp. 61-62)। এ চিঠির ভাষা চাকমা রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দেশক। অধিকন্তু পাদ্রী সেবাস্তিয়ান ম্যানরিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও সতের শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তে চাকমা রাজ্যের অবস্থিতিকে প্রমাণ করে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো ১৩৪৩ সনে প্রকাশিত *পাঞ্চজন্য* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ম্যানরিকের বাংলা পরিভ্রমণের কথা

উল্লেখ করেছেন। ম্যানরিক পাঁচ বছর আরাকানে ছিলেন। তাঁর মতে, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ম্যানরিক। তাঁর বর্ণনানুসারে চট্টগ্রামের পূর্বে ছিল 'কিংডম অব চাকোমাস' অর্থাৎ চাকমা রাজ্য, উত্তরে সমভূমিতে ভূলুয়া রাজ্য ও ভূলুয়ার পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য (কানুনগো, ১৩৪৩ব.)।' পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গেজেটিয়ার প্রণেতা হাচিনসনও ১৬০০ সালের মধ্যে চাকমারা রাঙ্গুনিয়ায় স্থানান্তরিত ও বসতি স্থাপন করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে চাকমা রাজা সেরদৌলত বা সাখুয়া ওরফে পাগলা রাজার মৃত্যুর পর চাকমাদের নেতৃস্থানীয় ধাবানা গোষ্ঠীর লোকজন মিলে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে এবং রাঙ্গুনিয়াকে তাঁর বাসভূমি হিসেবে নির্বাচন করে। হাচিনসনের ভাষায়,

> Dessension among the people, together with the fact of their having no recognized head to whom they might refer their differences, finally prompted the descendants of the Diwans to take counsel amongst themselves, and to decide on selecting another Chief who should rule over the tribe. The selection fell on a descendant of Dhabana who was duly installed Chief, and *Rajanagar near Rangunea was fixed upon his residence and the headquarters of the tribe* (Hutchinson, 1906, p. 23).

সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা মুঘল প্রদেশে পরিণত হয়। অতঃপর সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সুবাদার শায়েস্তা খাঁন চট্টগ্রাম অভিযান করেন। তাঁর শাসনামলে ১৬৬৬ সালে মুঘল শক্তির নিকট আরাকান শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এতে চট্টগ্রাম 'সরকার ইসলামাবাদ' নামে সরাসরি মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে চলে আসে।

চাকমারা ধীরে ধীরে মুঘল শক্তির নৈকট্যে চলে আসে। মুঘলযুগে চাকমাদের প্রথম রাজা নির্বাচিত হন চন্দন খাঁ এবং তাঁর বাসস্থান ছিল জুমবঙ্গের দক্ষিণে। অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দীন ইংরেজিতে তর্জমাকৃত একটি ফার্সি নথির বরাত দিয়ে এ কথা উল্লেখ করেছেন। চাকমা রাজ্যসীমার মধ্যে কর্ণফুলী থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা ছিল জুমবঙ্গের উত্তর কুল এবং শিলক থেকে সাঙ্গু পর্যন্ত ছিল দক্ষিণকুল। চন্দন খাঁর বাসভূমি দক্ষিণকুলে বলে উক্ত ফার্সি নথি নিশ্চিত করেছে। প্রথমদিকে চাকমা রাজারা মুঘল সরকারকে কোনো কর বা নজরানা দিতেন না। পরবর্তী চাকমা রাজা জালাল খান সমতলের ব্যবসায়ীদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদানের জন্য চট্টগ্রামস্থ মুঘল প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান। আলমগীর মো. সিরাজুদ্দীনের মতে, এর কারণ হলো:

> In fact, what brought them under the political influence of the Mughal government was their more advanced culture and living style. They could not live long in the isolation of the unproductive and

> inhospitable hill without sacrificing some of their comforts and ncecessaries of life they had been used to in their former abode. … Given the adverse conditions, the Chakmas did what was most natural and necessary for them – they established contact with the Mughal administration of Chittagong (Serajuddin, 1984a, pp. 90-98).

চাকমা রাজারা মুঘল সরকারকে বাৎসরিক ১১ মণ কার্পাস কর বা শুল্ক হিসেবে পরিশোধ করবেন এমন শর্তে সমতলের ব্যবসায়ীদের পার্বত্য অঞ্চলের প্রবেশ ও ব্যবসার অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু কার্পাস তুলা উসুলকারীরা চুক্তি লংঘন করে প্রতারণার আশ্রয় নিলে রাজা জুবল খাঁ বা জালাল খান মুঘলদেরকে কার্পাস শুল্ক প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এতে চাকমা-মুঘল সম্পর্কে অবনতি হয় ও সংঘর্ষ বাঁধে। মুঘলদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের প্রথম দিকে চাকমা রাজা জালাল খান বিজয়ী হলেও বৃহৎ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে তার শেষ রক্ষা হয়নি। মুঘল দিওয়ান কিষান চাঁদ রাজবাড়ি আক্রমণ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চাকমা রাজা আরাকানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আরাকান রাজদরবারে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি হলে পরবর্তী চাকমা রাজা শেরমস্ত খাঁ পুনরায় চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। এমতাবস্থায় তিনি ১৭৩৭ খ্রি. চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করে মুঘলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর জন্য এটি ছিল একটি বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। বস্তুত শেরমস্ত খাঁর সময় থেকে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় (Serajuddin, 1984a, pp. 90-98)। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজবংশের পুনরাগমন ও রাজ্যপাট স্থাপনের ক্ষেত্রে শেরমুস্ত খাঁ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁ গোলযোগপূর্ণ আরাকানে অনিশ্চিত অবস্থান পরিত্যাগ করে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে চট্টগ্রামের মুঘল ফৌজদার জুল কাদের খাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।[২] এটা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এতে তিনি সফল হন এবং মুঘল সরকারের নিকট থেকে রাঙ্গুনিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ কোদালা মৌজা এলাকায় জমিদারি লাভ করেন এবং

[২] ব্রিটিশ আমলের রাজস্বসংক্রান্ত সরকারি নথিতে লেখা আছে: In 1099 Muggy stile [A.D. 1737] Shairmist (Shermast) Khan came from Arracan to Zoalkudder Khan with whom he obtained an audience and paid his respects and took up his residence together with his family and dependants in the Hills of Rangoneah district. He also obtained a perwannah from the Huzoor granting him the junglah in mouzah Kodallah etc. This jungle he cultivated and it became a chowdry registered in the Sudder Dufter in the name of Sugdoo Roy his son, for which he paid revenue to government. *Proceedings of the Committee of Revenue,* 6 May 1784. Cited in Serajuddin, A. M. (1984). "The Chakma Tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18the Century" in *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irreland (1*): 90-98.

ধীরে ধীরে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল তাঁর এখতিয়ারাধীনে চলে আসে। এজন্য প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন শেরমস্ত খাঁকে রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজপরিবারের 'ভাগ্য নির্মাতা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে,

> শেরমস্ত খাঁ ছিলেন পরিবারের ভাগ্য-নির্মাতা যিনি ১৭৩৭ সালে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে অভিবাসন করেন এবং চট্টগ্রামের তৎকালীন মুঘল ফৌজদার জুল কাদের খানের নিকট থেকে অনুসারীসহ রাঙ্গুনিয়ায় বসতিস্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। তিনি ফৌজদারের নিকট থেকে কোদালা মৌজায় পতিত জমি লাভ করেন যা তিনি জমিদারি হিসেবে বন্দোবস্ত করেন। এছাড়া ফৌজদার তাঁকে কার্পাস মহলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও অর্পণ করেন। শেরমুস্ত খাঁ ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান ও ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং অন্য উপজাতিদের নিকট নিজেকে চিফ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন (Serajuddin, 1971b, pp. 90-98)।

কর্ণফুলীর শাখা নদী রাঙ্গুনিয়ায় দুটি উপনদীতে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তরের প্রবাহ ইছামতি এবং দক্ষিণের প্রবাহ শিলক নামে পরিচিত। এই শিলক উপনদীর তীরে শেরমস্ত খাঁর বন্দোবস্তপ্রাপ্ত জঙ্গল কোদালা জমিদারি অবস্থিত। শেরমস্ত খাঁর স্বীয় তেজ, দক্ষতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মতান্তরে পালকপুত্র শুকদেব রায়ের কর্মদক্ষতায় জঙ্গলাকীর্ণ মৌজায় চাকমা বসতি বাড়তে থাকে। শুকদেব রায় নিজেও নবাব সরকারের নিকট থেকে 'শুকদেব তরফ' নামে বন্দোবস্ত লাভ করেন। রাঙ্গুনিয়ার শিলক তীরে মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করে শুকবিলাস নামে নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন (বড়ুয়া, ২০০৫,পৃ. ৬১)। সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া ১৯৮৪ সালে শুকবিলাসে চাকমা রাজবংশের বহুস্মৃতি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে, "শুকদেবের নির্মিত রাজবাড়িটা ছিল রাজাহাটের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ফরেস্ট অফিসের দক্ষিণ-পূর্বদিকের পাহাড়ের উপর। রাজবাড়ির সামনে ছিল বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধমন্দির (বড়ুয়া, ১৯৮৪, পৃ. ৯-১০)।" এভাবে শুকবিলাসে চাকমা বসতি ক্রমশ প্রসার লাভ করে। চাকমারা বিপুল সংখ্যায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের মাতামুহুরী নদী উপত্যকা থেকে উত্তর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং পূর্ব দিকে পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অশোক কুমার দেওয়ানের মতে শুকবিলাসকে কেন্দ্র করেই চাকমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতে থাকে। এভাবে শেরমুস্ত খাঁর রাজত্বে শুকদেব রায়ের ব্যবস্থাপনায় রাঙ্গুনিয়ার কোদালা মৌজার জমিদারির ক্রমশ উন্নতি সাধিত হয়। শুকদেব রায় শিলক নদীর তীরে রাজবাড়ি ও প্রধান কাছারি প্রতিষ্ঠা করেন যা প্রজাসাধারণের দৃষ্টিতে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। শুকদেব রায় পরিখা খনন ও দুর্গ নির্মাণ করে তাঁর জমিদারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। পদুয়া ইউনিয়নে স্থাপন করেন রাজার হাট। এভাবে শুকবিলাস হয়ে ওঠে উদীয়মান চাকমা রাজশক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতীক। কিন্তু দীর্ঘকাল

সুখভোগের ভাগ্য চাকমাদের কপালে নেই। বাংলার ক্ষমতাকেন্দ্র মুর্শিদাবাদে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঢেউ চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে রাঙ্গুনিয়াতেও আছড়ে পড়ে।

৫. রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বড় রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হন। মুর্শিদাবাদের দরবারি রাজনীতিতে কোম্পানি চালকের আসনে বসে। এর ফলে নবাবী শাসনে আসে আমূল পরিবর্তন। মসনদে বসেন মীর জাফর। কিন্তু তিনি কোম্পানির ক্রমবর্ধমান অর্থলিপ্সা পূরণে ব্যর্থ হন। ফলে কোম্পানির মনোনীত নতুন নবাব মীর কাসিম ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে দেশরক্ষার খরচ যোগানোর জন্য চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার কোম্পানিকে হস্তান্তর করেন। হস্তান্তরিত চট্টগ্রাম জেলায় ইংরেজ শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি হ্যারি ভেরেলস্ট নবনিযুক্ত চট্টগ্রাম কাউন্সিল প্রধান হিসেবে নায়েব মুহাম্মদ রেজা খানের নিকট থেকে চট্টগ্রামের শাসনভার বুঝে নেন। এতে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইসলামাবাদ নামে খ্যাত চট্টগ্রাম কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে আসে। ব্রিটিশরা সমগ্র চট্টগ্রামের রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে তখন কয়েক প্রকার জমিদারি ও রাজস্ব মহল ছিল। পূর্ব প্রান্তে রাঙ্গুনিয়ায় ছিল চাকমাদের শাসিত কার্পাস মহল।

ভেরেলস্টের শাসনামলে চাকমা শাসিত রাঙ্গুনিয়ার কার্পাস মহল খাজনা উসুলের প্রসঙ্গ সামনে আসে। বিরোধ এড়ানোর জন্য বিচক্ষণ শাসক ভ্যারেলস্ট কার্পাস মহল তথা চাকমা রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করে দেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি সরকারি ঘোষণায় শেরমুস্ত খাঁর ভৌগোলিক এখতিয়ার স্পষ্ট করা হয়। তাতে নিজামপুর থেকে কুকিরাজ্য এবং ফেনী থেকে সাঙ্গু পর্যন্ত রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজ্যের সীমানা স্বীকৃত হয়। এ থেকে স্পষ্ট শেরমস্ত খাঁর রাজ্যসীমা ও প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শের জব্বার খানের রাজত্বকালেও চাকমা রাজ্যসীমা তাঁর নামে নিবন্ধিত হয়েছিল। এভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের প্রারম্ভে রাঙ্গুনিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে চাকমা রাজাদের শাসনাধিকার স্বীকৃত হয় (গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, ১৮৬৯, পৃ. ১৮)। স্থানীয় শাসনে নিযুক্ত ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শাসননীতি সবসময় একরকম থাকে না। চট্টগ্রামের প্রথম ব্রিটিশ শাসক হ্যারি ভেরেলস্ট যে উদারনীতি নিয়ে চাকমা অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ ও তথায় হস্তক্ষেপ-না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী প্রশাসকদের আমলে সেটা অনুসৃত হয়নি। তারা রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা অঞ্চলের কার্পাস মহল রাজস্ব আদায়ের নামে চাকমা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ এবং শঠতা ও নিপীড়ন শুরু করলে চাকমা রাজা সেরদৌলত খাঁ কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উত্তরবঙ্গের ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহের (১৭৬৩-১৮০০ খ্রি.)

সমসাময়িককালে রাঙ্গুনিয়ার কোম্পানির সরকারের অনুসৃত অন্যায্য রাজস্বনীতির বিরুদ্ধে এক দশকব্যাপী চাকমা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যা সমকালীন স্থানীয় ব্রিটিশ প্রশাসকদের কপালে দুশ্চিন্তার বলিরেখা এঁকে দিয়েছিল।

রাঙ্গুনিয়ার চাকমা ইতিহাসে একটি গৌরবময় রাজনৈতিক ঘটনা হলো তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম। চাকমা ইতিহাসে এ সংগ্রামের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজাদের এ সংগ্রামকে 'ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন' এবং সেনাপতি রনু খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত চাকমা পালোয়ানদের যুদ্ধকে 'ব্রিটিশ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (ইসলাম, ২০১২, পৃ. ৩৭-৪০)। চাকমা ইতিহাসে অকুতোভয় বীরপুরুষ সেরদৌলত খাঁ কোম্পানির অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেন। চাকমা রাজারা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেও কুকিরাও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলে এটি ব্রিটিশ ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা-কুকি আদিবাসীদের সম্মিলিত সংগ্রামে রূপ নেয়। সেরদৌলত খাঁ অনুপ্রবেশকারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রাঙ্গুনিয়ার ব্রিটিশ প্রশাসনের সুবিধাভোগী চাকলাদার, জমিদার, তালুকদার, ইজারাদারদের খাজনা বন্ধ করে দেন। চাকমা রাজকীয় নির্দেশ অমান্যকারীদের ধানের গোলা তাঁর পালোয়ানদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। রাঙ্গুনিয়া এলাকায় গোচারণ, চাষাবাদ করতে হলে চাকমা রাজ সরকার থেকে পাট্টা বা লিখিত সনদ গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং একইসঙ্গে কোম্পানি সরকার প্রদত্ত পাট্টা বা সনদকে অবৈধ ঘোষিত হয় এবং সেসব দলিলে অগ্নিসংযোগ করা হয় (Islam, 1978, pp. 83-84)। সেরদৌলত খাঁ ছিলেন চাকমা পালোয়ান বা সেনাদের সর্বাধিনায়ক। তাঁর ডেপুটি হিসেবে যুবরাজ জানবক্স খাঁ এবং সেনাপতি রণু খাঁ তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। এছাড়া ডুলুব, চেরি, কনু, থুট্যাং, শিকদাস নামে কয়েকজন সেনাপতি বীরদর্পে লড়াই করেন। তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় রাঙ্গুনিয়ার ব্রিটিশ খেদাও সংগ্রাম। তাঁরা নিজস্ব দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন।[৩] কোম্পানির সেনাদল প্রশিক্ষিত ও উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হলেও চাকমা যোদ্ধাদের রণনৈপুণ্য ও কৌশলের কাছে তারা দাঁড়াতেই পারেনি। কোম্পানি সরকারের মোতায়েনকৃত সেপাই, সাজোয়াল, ক্যাপ্টেন, মেজরদের পরিচালনাধীন সরকারি বাহিনীর জন্য শোচনীয় ব্যর্থতা ও হতাশাই ছিল যুদ্ধকালীন নিত্য সংবাদ যা ফোর্ট উইলিয়ামস্থ কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে উৎকণ্ঠায় ফেলে দেয়। সেরদৌলত খাঁর অবিচল দৃঢ়তায় আমৃত্যু

[৩] ১৭৭৮ সালের ২৬ জুন তারিখ রাঙ্গুনিয়ার কয়েকশ্রেণির জমিদার, তালুকদার, চৌধুরীরা একত্রিত হয়ে কোম্পানি সরকারের নিকট চাকমা রাজার বিরুদ্ধে লিখিত নালিশ দিয়েছিল। তাতে আন্দোলন ও অবরোধের প্রকৃতি জানা যায়।

সংগ্রাম চালিয়ে যান। সুনীতি ভূষণ কানুনগোর লেখায় সেরদৌলত খাঁর সংগ্রামী চেতনা ও কৌশল সম্পর্কে জানা যায়:

> ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণের মুখে তাঁকে রাজধানী ত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি চাকমা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার জন্য জনগণকে উদ্দীপিত করতেন এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ রফা করতেন তবে তাঁর রাজপদ অক্ষুণ্ন থাকতো কিন্তু রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষিত হতো না। বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। কেবলমাত্র রাজা হিসেবে নয়, একজন বীর সংগ্রামী হিসেবে তিনি তাঁর রাজ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন (কানুনগো, ২০১৬, পৃ. ৪৪)।

কোম্পানি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাবের কাছ থেকে চট্টগ্রামকে পেয়েছিল হস্তান্তরিত জেলা হিসেবে। মূল চট্টগ্রামে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি নতজানু হয়ে কোম্পানি শাসন মেনে নেয়। কিন্তু বাংলায় ব্রিটিশদের অন্যায়, অত্যাচার, লুটপাত ও ক্রমবর্ধমান আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধটি আসে সমাজের নিম্নবর্গ থেকে। বাংলায় ফকির সন্যাসী সম্প্রদায়ই প্রথম ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। লিপ্ত হয় দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ সংগ্রামে। রাঙ্গুনিয়ার চাকমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পথিকৃৎ আন্দোলন। তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ১৭৭৬ খ্রি. থেকে ১৭৮৭ খ্রি. পর্যন্ত অবিরাম গতিতে চলেছিল। পরে প্রজাবৎসল চাকমা রাজা জান বক্স খাঁ ঘোষাল পরিবারের মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সমঝোতা স্থাপন করেন। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার জান বক্স খাঁকে পার্বত্য অঞ্চলের 'বোনাফাইড চিফ' বা 'প্রকৃত শাসক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (Islam, 2018, pp.117-144)। এ আন্দোলনের মাধ্যমে চাকমাদের স্বাজাত্যবোধ, সাহসিকতা ও দেশপ্রেম ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করে। এ বিদ্রোহের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করা পর্যন্ত চাকমারা আর কখনো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু তাদের এই সংগ্রামী চেতনা বিলুপ্ত হয়নি এবং এই বীরত্বপূর্ণ ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মের চাকমা রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

৬. রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজাদের শাসনব্যবস্থা

ব্রিটিশ সরকারের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও শান্তি স্থাপনের পর রাজা জান বক্স খাঁ স্বীয় রাজ্য পুনর্গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এ লক্ষে তিনি কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেহেতু লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁকে চাকমা জাতির 'প্রকৃত শাসক' ও

রাঙ্গুনিয়ার জমিদারিতে পুনর্বহাল করেছেন সেহেতু তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন সরকারের সঙ্গে নতুনভাবে কার্পাস মহল তথা 'জুমবঙ্গ' বন্দোবস্ত সম্পাদন করেন (Mackenzie, 1884, p.332)। এছাড়া সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত শুকবিলাস নগরীতে অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করে নানাবিধ অসুবিধার দরুণ তিনি রাজধানী উত্তর দিকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তদনুযায়ী রাজা জান বক্স খাঁ উত্তর রাঙ্গুনিয়ার ইছামতী নদীর তীরঘেঁষা সমতল জায়গাটিকে নতুন বাসভূমি ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। নতুন জায়গার নামকরণ করেন রাজানগর এবং তথায় নতুন পাকা রাজবাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়ার মতে, জায়গাটিতে পূর্ব থেকে চাকমা অধ্যুষিত ছিল (বড়ুয়া, ১৯৮৪, পৃ. ১১)। কালক্রমে রাজানগর চাকমা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশদের সাথে একদশকব্যাপী প্রত্যক্ষ লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে জান বক্স খাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তিনি রাজবাড়ি নির্মাণসহ বহুকাজ অসমাপ্ত রেখেই পরলোক গমন করেন। অতঃপর চাকমা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার নীতি (রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই হবেন পরবর্তী রাজা) অনুসারে সিংহাসনে আরোহন করেন তদীয় পুত্র যুবরাজ টব্বর খাঁ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজা টব্বর খাঁ'র রাজত্বকালে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করে পরে তার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ইছামতী নদীর তীরে রাজানগরেই টব্বর খাঁর রাজবাড়ির অবস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণে পাই, 'A little higher up on the opposite side enters a rivulet named Ishamutty, which comes from the north. … This rivulet is too small to admit canoes, but 6 ghurries journ[ey] up from its mouth is a residence of Taubboka, chief of the Chakma nation. This is only temporary abode, where the chief comes to collect the revenues of those parts of Runganea which still remain his property (Schendel, 2008, p.101). বুকানন ভ্রমবশত টব্বর খাঁর রাঙ্গুনিয়ার মূল রাজবাড়িকে অস্থায়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে বুকাননের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভাষা সহজ, ভদ্রজনোচিত ও মার্জিত। তিনি টব্বর খাঁকে 'চিফ অব চাকমা নেশন' বা চাকমা জাতির প্রধান ' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাজা ত্রিদিব রায়ের মতে রাজা টব্বর খাঁর আমলেই রাজানগর রাজবাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছিল (Roy, 2003, p. 54)। টব্বর খাঁর আরেকটি কীর্তি ছিল রাজবাড়ির সম্মুখে 'সাগর দিঘি' খ্যাত বিশাল দিঘি খনন (Roy, 2003, p. 32)। টব্বর খাঁ দেওয়ানদের মাধ্যমে প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করতেন। চৌকি স্থাপন করে ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহণ থেকে আদায় করতেন শুল্ক। রাঙ্গুনিয়ায় ইছামতির মোহনায় শুল্ক চৌকি স্টেশন ঘাটচেক নামে একটি জায়গা এখনো বিদ্যমান। এছাড়া বাঁশবন ও শনখোলা প্রভৃতি বাঙ্গালিদের নিকট ইজারা দিতেন। টব্বর খাঁর সময় চাকমা বসতি পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি, বরকল, বসন্ত,

সুবলং, কাইন্দে, রেইংখ্যংবাক, কাপ্তাই, সীতার ঘাট, চেঙ্গী উপত্যকা, কাচালং উপত্যকায় চাকমা গ্রাম গড়ে ওঠে। এভাবে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর রাজধানী শহর হলেও চাকমা রাজ্যের সীমানা পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এক কথায় চাকমা রাজ্যসীমা হালদা নদীর পূর্ব পাড় এবং রাঙ্গুনিয়া থেকে শুরু করে পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এটা সত্য যে, রাজারা চাকমা জাতির হলেও চাকমারাই শুধু তাদের প্রজা ছিলেন না। সমতল রাউজান, রাঙ্গুনিয়া এলাকার বড়ুয়া, হিন্দু এবং মুসলমানরাও চাকমা রাজাদের প্রজা ছিল (হাসন, ১৯৯৭, পৃ. ৫৮)। অন্যদিকে উচুঁ পাহাড়ের বাসিন্দা কুকি, খিয়াংরাও ছিল চাকমা রাজাদের করদপ্রজা। বুকানন লিখেছেন, "The natives say, that, by a road leading across these hills, it takes from sun rise to noon to go from hence to the house of Taubboka in Rungnea. Between this and these hills live many Koongkies, or Lang-ga who are tributary to the Rajah'' (Schendel, 2008, p.10). রাঙ্গুনিয়ার এক বিদ্বান ব্যক্তি লিখেছেন, 'চাকমা রাজাদের রাজ্য বলতে প্রধানতঃ রাঙ্গুনিয়া বুঝালেও পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাউজানও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল (হাসন, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭-৬৭)।' এভাবে রাঙ্গুনিয়াকে কেন্দ্র করে চাকমা শাসনের বুনিয়াদ রচিত হয়। চাকমা রাজাদের প্রশাসনিক কাঠামো এ সময় সুবিন্যস্ত হয়। সুনীতি ভূষণ কানুনগোর লেখনীতে চাকমা রাজসরকারের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে,

> The Chakmas had a regular government, though it was a simple type of government. … The Chakma kingdom was a loose territorial organization of the Chakma people living scattered in a wide area. … The Chakma territory in the eighteenth century was ruled by a monarchical form of government headed by a king. The administrative organization of the Chakmas was chiefly consisted of the king and senior government officials such as dewan, naib, shiqdar etc (Qanungo, 1998, pp. 18-19).

রাজা শেরমুস্ত খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবাবী সরকারকে বাৎসরিক কার্পাস কর দিয়ে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বজায় রেখে রাজ্য শাসন করতেন। জানবক্স খাঁও স্বাধীনতা বজায় রেখে শাসন করেছিলেন। এই ধারা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলমান ছিল। এ বিবেচনায় মুঘল ও কোম্পানি আমলে চাকমা রাজ্যটি ছিল বংশানুক্রমিক রাজা শাসিত করদ-রাজ্য। তারা প্রথা ও গোত্রতান্ত্রিক আনুগত্য বলে প্রজাদের নিকট থেকে ঘরপ্রতি কর আদায় করতেন। এ কর ছিল শাসকের কর্তৃত্বের প্রতীক। রাজারা ছিলেন সমাজপতি। সামাজিক বিরোধ-মীমাংসায় রাজার আদেশই ছিল চূড়ান্ত। রাজারা কর আদায়, সামাজিক বিচার, জুমভূমি বন্টন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি কাজের সুবিধার্থে দেওয়ান ও খীসা নিয়োগ করতেন। গ্রামের কর আদায় ও

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব ছিল দেওয়ানদের ওপর ন্যস্ত। এ কাজের জন্য দেওয়ানরা আদায়কৃত কর থেকে কমিশন লাভ করতেন। এভাবে আঠারো শতকের মধ্যেই চাকমা রাজাদের সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণের যুগ হিসেবে খ্যাত। এ যুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়। চাকমা সমাজব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রাঙ্গুনিয়ার চাকমা ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকাশে নব দিগন্তের সূচনা হয়। রাজানগরে রাজত্বকারী রাজাদের মধ্যে উনিশ শতকের প্রারম্ভে রাজা ধরম বক্স খাঁ (১৮১২-১৮৩২ খ্রি.) ও চল্লিশের দশক থেকে রানি কালিন্দীর (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রি.) যুগ ছিল চাকমা রাজ্যের 'উদীয়মান প্রতিপত্তি'র যুগ। তাঁদের দুজনের শাসনামলে চাকমা রাজ্যের বহুমূখী শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। স্বীয় কর্মগুণে ধরম বক্স খাঁ তাঁর প্রজাদের নিকট 'মহারাজা ধরম বক্স খাঁ' নামে খ্যাত ও সমাদৃত হন। ধরম বক্স খাঁর শাসনামলে চাকমাদের ঐক্যের কথা প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসক-ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টারও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'Not forty years ago [this was written in 1873] the Chakma tribe was a united entity strongly bound together by the ties of kinship and clanship, and under the direction of an able head, the Raja Dharm Baksh Khan (Hunter, 1976, p. 92).' তিনি রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজবংশের মুলিমা গোত্র থেকে খাঁ উপাধিধারী শেষ রাজা। *চাকমা জাতি* গ্রন্থ প্রণেতা সতীশ চন্দ্র ঘোষের মতে, 'রাজা ধরম বক্স খাঁ ছিলেন 'একাধারে তেজ ও ক্ষমার আকর' (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ৬৪)। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ফার্সি লেখক মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর তাঁর *আহাদিসুল খাওয়ানিন* (১৮৫৫) গ্রন্থে চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, "এই ধরম বখ্শ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ তাঁর মতো শক্তিশালী ও সাহসী ছিলেন না। তিনি চাকমা জাতির কাছে পেয়েছিলেন শাহী উপাধি, ... তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর বিধবা রানি কালিন্দী। চাকমারা এখন তাঁরই আধিপত্য মেনে চলে, রানি বলে সম্বোধন করে। কিছু সংখ্যক পাহাড়িয়া ও মগ তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছে (খান, ২০১৩, পৃ. ৭৫)।" রাজা ধরম বক্স খাঁ পার্বত্য অঞ্চলে জুমচাষ নির্ভর চাকমা সমাজে সর্বপ্রথম হালচাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এ লক্ষে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাঙ্গুনিয়া থেকে কিছু মুসলমান প্রজা এনে রাঙ্গামাটির আশপাশে বসতি দেন। রাঙামাটিবাসীর নিকট এদের পরবর্তী প্রজন্ম 'পুরানবস্তী বাঙালি' বলে পরিচিত হয়। তারা রাঙামাটিতে সমতল জমিতে লাঙল দিয়ে হালচাষ পদ্ধতির প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে চাকমারা এ পদ্ধতিতে ফসল বুনা রপ্ত করে এবং এভাবে ধানচাষ করে অনেক চাকমা ধনশালী হন ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। এছাড়া তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে 'মহারাজ ভট্টাচার্য'

উপাধিতে ভূষিত করেন যারা রাজ পরিবারের বিভিন্ন লগ্ন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাজা এ ব্রাহ্মণ পরিবারকে 'রাধাকৃষ্ণ-নয়াবাদ' নামে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন (ঘোষ, ১৯০৯, পৃ. ৬৫-৬৬)। ক্ষণজন্মা রাজা ধরম বক্স খাঁর অপর একটি অক্ষয় কীর্তি ছিল চট্টগ্রাম শহরে বসবাসের জন্য আন্দরকিল্লা মৌজার প্রায় ১১ একর ঢালু পাহাড়ি জায়গাজুড়ে একটি প্রাসাদোপম রাজকুঠি নির্মাণ যা লাল কুঠি নামে পরিচিত। কথিত আছে তত্ত্বঙ্গ্যা প্রজা এবং পর্তুগিজ প্রকৌশলীদের নকশায় রাজকুঠিটি নির্মিত হয়েছিল। রাজাদের বাসভবন থাকায় জায়গাটির নামকরণ হয় রাজাপুর (বর্তমানে রাজাপুর লেইন)। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে চট্টগ্রামকে বিভাগে রূপান্তর করা হলে সরকার এখানে একজন বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত করে। তাঁর বসবাসের জন্য উপযুক্ত বাসভবন তখন ছিল না। তখন সরকার চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁর নির্মিত এ সুরম্য ভবনটি নবনিযুক্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো বা বাসভবন হিসেবে ভাড়া নেয়। এ সংক্রান্ত একটি দুষ্প্রাপ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আইনি দলিলে উল্লেখ আছে[৪]:

> Raja Nalinaksha Roy, father of the petitioner sent an application to the Secretary, Home Department, … on November, 19,1949. He gave a history of the land and the buildings in application. According to that application the building which was … popularly known as Commissioner's Bungalow was built by late Raja Dharum Bux in about 1820 A.D. and was used by him till 1832. His wife Rani Kalindi being an orthodox lady observing Pardah never visited the Chittagong town and so the house was rented out to the Commissioner of the Chittagong Division. Since then the Commissioner has been using this building as his residence (Chakma Raja Archives,1960).

উনিশ শতকের রাঙ্গুনিয়ার চাকমা শাসনের ইতিহাসে অন্য একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো কালিন্দী রানি নামে একজন তেজস্বী নারী শাসকের রাজত্ব। বিরাজ মোহন দেওয়ানের মূল্যায়নটিও অনুরূপ। তাঁর মতে, 'চাকমা রাজাগণের মধ্যে রাণী কালিন্দীর সময়টি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার। যেহেতু তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও রাজ্য শাসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন (দেওয়ান, ২০০৫, পৃ. ১৩৯)। রানি কালিন্দী ছিলেন চাকমা রাজা মহারাজ ধরম বক্স খাঁর (১৮১২- ১৮৩২) প্রিয়তমা প্রথমা স্ত্রী বা রাজমহিষী। রাজা ধরম বক্স খাঁ অকস্মাৎ লোকান্তরিত হলে কোম্পানি সরকার রানির উত্তরাধিকার দাবিকে উপেক্ষা করে রাজার তৃতীয় স্ত্রীর নাবালিকা কন্যাকে উত্তরাধিকারী বলে মনোনীত করে। কিন্তু তাতে চাকমা রাজ্যে রাজস্ব সংগ্রহসহ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়।

[৪] Arbitration Case No. 2 of 1960. Raja Tridiv Roy Chakma Raja ... Petitioner. Versus, Province of East Pakistan represented by the Collector, Chittagong... Opposite Party.

এতে রানি প্রয়াত স্বামীর পাটরানি হিসেবে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য আইন ও আদালতের আশ্রয় নেন। ফলশ্রুতিতে কোম্পানি সরকার ১৮৪৪ সালে রানি কালিন্দীকে চাকমা রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ রানিকে স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য ঘরে-বাইরে সংগ্রাম করতে হয়। স্বীয় অবস্থান, ক্ষমতা ও মর্যাদা সুসংহত করার পর তিনি প্রজাদের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৭৩ সালে জীবনাবসান পর্যন্ত রাজকীয় দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রশাসন, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্বজাতি ও রাঙ্গুনিয়াবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেন। রানি কালিন্দীর জীবন ও কীর্তিগাথা উত্তরসুরীরা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রধান অমাত্য ত্রিলোচন দেওয়ানের পুত্র শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁর আত্মজীবনীতে রানি কালিন্দীকে বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী, অতিথিপরায়ণা, মিষ্টভাষিণী ও সদালাপী প্রভৃতি গুণে গুণান্বিতা বলে বর্ণনা করেন (দেওয়ান, ১৯৭০, পৃ. ২৯)। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজানগরের মহামুনি মন্দিরের পাশে রাজা ভূবন মোহন রায় কর্তৃক স্থাপিত সমাধিলিপিতে রানি কালিন্দী সম্পর্কে উৎকীর্ণ আছে:

> রাণী কালিন্দী ইনি মহারাজা ধরম বক্স খাঁর পাটেশ্বরী রাণী। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকমা রাজ্য শাসন করার ভার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রাণীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি এই প্রকার ন্যায়, দায়িত্য এবং দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন যে, চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র চিরকাল তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ১৮৬৯ খীষ্টাব্দে রানি কালিন্দী রাজানগর রাজবাড়িতে পবিত্র চিঙ্গ (সীমা) স্থাপন এবং মহামুণি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তির সম্মুখে চৈত্র শেষে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের সংমিশ্রিত যে বাৎসরিক বিরাট মেলা বসিয়া থাকে ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি স্তম্ভ। ... ইনি অতিশয় তেজস্বিনী ও মেধাবিনী রাজ্ঞী ছিলেন (মহামুনি মন্দির লিপি দ্রষ্টব্য)।[৫]

বিশ শতকের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় কালিন্দী রানি প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Rani Kalindi, the Queen Regnant, was renowned for her wisdom, statesmanship and generosity to all her subjects that belong to different religions' (Roy, 2003, pp. 39-41). রাঙ্গুনিয়ার চাকমা শাসকদের মধ্যে রানি কালিন্দীর শাসনামলে চাকমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি চাকমা জাতির ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক। কিন্তু স্ত্রীলোক হলেও তিনি বহু বছর যাবৎ জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্বের সাথে রাজ্য শাসনের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর আমলেই ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু কোম্পানি আমলে সরকার চাকমা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতো না। ফলে রানি কালিন্দীর চাকমা রাজ্য ছিল

[৫] রাজা ভূবন মোহন রায় কর্তৃক উৎকীর্ণ রানি কালিন্দী সমাধিলিপি (সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে প্রাপ্ত)

একপ্রকার স্বশাসিত। উইলিয়াম উইলসন হান্টার স্পষ্ট করে সে-কথা উল্লেখ করেছেন যে, 'Before 1860, and to a less extent since then, the internal government of the country which now forms the Chittagong Hill Tracts, was in the hands of three hill Chiefs, assisted by a number of subordinate village officials. These chiefs were, and are still, independent of each other. The Chakma tribe and their villages are all under the control of one chief (Hunter, 1973, p. 88).' পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশাধিকারের সময় চাকমা অঞ্চলের শাসক ছিলেন কালিন্দী রানি। তিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত স্বশাসন পরিচালনা করেন। তিনি রাজপ্রশাসন, কর আদায়, উপদেষ্টা, উকিল মোক্তার, কর্মকর্তা নিয়োগ, ধর্মপ্রচার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতির বিকাশে স্বাধীনভাবে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। ভূমি ও রাজস্ব প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। চাকমা বসতির বিস্তৃতি ঘটায় তিনি খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে লিখিত পাট্টাভিত্তিক তালুকপ্রথার প্রবর্তন করেন। তালুক-শাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে চাকমা সমাজে তালুকদার হিসেবে পরিচিত হয়। তাঁর শাসনামলে চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ রচিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিযুক্ত ব্রিটিশ জেলা প্রশাসক আর. এইচ. এস. হাচিনসন এর লেখায় চাকমা রাজ্যেশ্বরী হিসেবে রানি কালিন্দীর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়:

> Otherwise, for forty years she proved a thorn in the side of the Government. She was an exceedingly able woman, and … She excercised a very great influence over her tribe, and was generally feared. She made a permanent settlement with the Dewans; and created others from amongst her families; in fact, *she was sole mistress of the hills till the year 1860,* when the patience of Government was exhausted, and the Chittagong Hill Tracts were created a district under the direct management of Government (Hutchinson, 1906, pp. 94-95).

রানি কালিন্দী স্বীয় যোগ্যতায় দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনার কারণে প্রজাদের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর শাসনাধীন চাকমা রাজ্যটি প্রাচীনযুগে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় খড়্গ রাজন্যবর্গের শাসনে গড়ে ওঠা উপ-আঞ্চলিক রাজ্যের চরিত্র ধারণ করে। তাঁর রাজত্বকালে রাঙ্গুনিয়ার নানাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে চাকমা ও বড়ুয়াদের ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী অবদান রাখেন। এ প্রসঙ্গে বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার বিবরণ প্রণিধানযোগ্য: "বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সার্বিক প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসু করে তোলেন চাকমা রানি কালিন্দী। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আমলে চাকমা রাজ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে একটি সামন্ত রাজ্য। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার রাজানগর ছিল চাকমা রাজ্যের রাজধানী। চাকমারাই শুধু তাঁর প্রজা ছিলেন না, বড়ুয়া, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানও ছিলেন তাঁর

শাসনাধীনে। ... চাকমা রানি কালিন্দী বাংলাদেশী বৌদ্ধদের বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মমত সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মানসে এবং প্রকৃত ধর্মজ্ঞান জাগরিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাবলি অনুবাদ ও রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টার অন্যতম এবং প্রথম ফসল হচ্ছে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" (বড়ুয়া, ২০০৫, পৃ. ২৩-২৪)।" তাঁর রাজত্বকালে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলব্যাপী বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

কালিন্দী রাণী পূর্ববর্তী শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাঙ্গুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য রাজা জব্বর খাঁ (১৮০১-১৮১২ খ্রি.) রাজভবনের দক্ষিণপাশে 'রাজার হাট' প্রতিষ্ঠা করেন যা এখনও আছে। রানি কালিন্দী রাজসরকার ও প্রজাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আরো বাজার স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ যথার্থই বলেছেন, 'রাঙ্গুনিয়ার "রানীর হাট" বোধ হয় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তদীয় কীর্তি ঘোষণা করিবে। ইহার পূর্বে তিনি স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে পদুয়ায় "রাজার হাট" স্থাপন করিয়াছিলেন (ঘোষ, ২০১০,পৃ. ৮৩)।' চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে রাঙ্গুনিয়ার *রানীর হাট* এখনও একটি বড় বর্ধিষ্ণু বাজার। স্থানীয় অর্থনীতিতে এ বাজারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রজাদের ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ-সুবিধার দিকেও রানি সুদৃষ্টি দেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য রানি কালিন্দী রাজানগর এলাকায় রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীমন্দির ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন (Roy, 2003, p. 41)। তিনি রাজভবনের (রাজানগর) সম্মুখীন বিশাল দিঘির পশ্চিম পাড়ে একখানি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রতিদিন নিয়মিত 'আযান' এবং সান্ধ্য প্রদীপ দিতে একজন বিশুদ্ধাচারী খোন্দকার নিযুক্ত রাখেন। এছাড়া নানাস্থানে মসজিদের সাহায্যার্থে রাজসরকার হতে অর্থ প্রদান করেন (ঘোষ,২০১০, পৃ. ৮৬)। রাজসরকার থেকে অনেক হিন্দু ও মুসলমান পরিবারকে নিষ্কর জমিদান করে বসতি দেন (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ৭২)। রাঙ্গুনিয়ার তৎকালীন রাজাগণ রাজধানী রাজানগর ও পার্শ্ববর্তী লালানগরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন জাতের হিন্দু ও বিভিন্ন গোত্রের মুসলমান নিয়ে এসে বসতি স্থাপন করায় বলে জানা যায়। পাহাড়ি এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এতদঞ্চলের ঘন বসতি ও বিভিন্ন শ্রেণির হিন্দু মুসলিম পরিবারের সমাবেশ দেখে একথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকে না (হাসন, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭-৬৭)।' এ কারণে রানি কালিন্দী রাঙ্গুনিয়াসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের তাবৎ মানুষের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করেন। রাজা দেবাশীষ রায় যথার্থই বলেছেন যে, "Until her death, she remained the unquestioned leader of the Chakma people and other peoples who lived within her territory' (Wangza, 2003, pp. 41-48).

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের (১৮৭৩-১৮৮৫ খ্রি.) শাসনকাল চাকমা ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় চাকমা রাজবংশে গোত্রধারার পরিবর্তন হয়– কারণ রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ওয়াংজা গোত্রভুক্ত। এছাড়া তাঁর সময়ে 'খাঁ' উপাধিধারী রাজাদের যুগের অবসান ঘটে এবং 'রায়' উপাধিযুক্ত নামকরণের সূচনা হয় যা আজ অবধি প্রচলিত আছে। এছাড়া তিনি রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে রাজত্বকারী সর্বশেষ রাজা কারণ তাঁর সময়ে ব্রিটিশ সরকারের চাপে চাকমা রাজন্যবর্গ সমতল চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হয়। তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যক্তিজীবনে খুবই সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। রানি কালিন্দীর স্নেহধন্য দৌহিত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি রানির স্নেহবাৎসল্যে লালিত পালিত হন। রানির অভিভাবকত্বে হরিশ্চন্দ্র ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সর্বপ্রথম সরকারি সনদ, উপহার ও উপাধি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সন্নিহিত পার্বত্যাঞ্চল বৃহত্তর ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত ব্রিটিশ প্রভাবাধীন চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ও ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ কুকি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করে। বলা বাহুল্য কুকিদের মধ্যে লুসাই, সেন্দুজ ও বনযোগীরা ছিল ভয়ানক আক্রমণাত্মক। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিতে সদর দপ্তর স্থাপন করে পূর্বাঞ্চলের লুসাইদের বিরুদ্ধে দমনাভিযান পরিচালনা করেন। রানির অনুমতিক্রমে হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ সেনাদের সাথে উক্ত লুসাই দমন অভিযানে ৫০০ জন অনুগামীসহ অংশগ্রহণ করেন। এ ঘটনা এতই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে বিষয়টি সুদুর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স এর নথিপত্রে লুসাই অভিযানে রানি কালিন্দীর সদিচ্ছা প্রসঙ্গে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার মেজর জে. এম. গ্রাহাম বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

> At my rquest the Ranee Kalindee has called out from 300 to 500 of her armed Chukma hillmen, … I haved just learned that a re-inforcement has been sent from Calcutta, I shall be glad to dispense with the services of the hillmen, … In calling out the Chuckmas, I had no great dependence on their fighting powers, and my object was more to make some little show of power, and to test the good will of the Ranee and her people, and I am glad to say that both have promptly answered the call made on them (House of Commons Paper, 1872, p. 27).

যাহোক লুসাই অভিযানে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার হরিশ্চন্দ্রকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে এবং তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বর্ণের চেইন ও হাতঘড়ি উপহার হিসেবে প্রদান করে। শুধু তাই নয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে

রানি কালিন্দীর জীবনাবসান ঘটলে ব্রিটিশ সরকার হরিশ্চন্দ্রকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজগদিতে অভিষিক্ত করে এবং ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে (Chakma Rajas' Archives, 1872) পরবর্তী সময়ে সরকারের কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজস্ব সার্কেলে বিভক্তি, হালচাষের খাজনা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাথে সরকারের দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং তাঁকে রাজানগর রাজবাড়ি ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে (যেখানে চাকমা জনসংখ্যা বেশি সেখানে) রাজবাড়ি ও রাজকীয় কাছারি স্থানান্তরে চাপ দেয়। এভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরের শেষরাজা হিসেবে বছরপাঁচেক রাজকার্য পরিচালনা করে বার্ধক্য বয়সে রাজ্যপাট রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করেন। এভাবে চাকমা রাজবংশের ইতিহাসে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী রাজা ভূবনমোহন রায় এর রাজ্যাভিষেকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রাঙ্গামাটি পর্বের। একসময় কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে স্থাপিত রাঙ্গামাটি চাকমা রাজবাড়িও কাপ্তাই হ্রদের জলে নিমজ্জিত হয় এবং পাকিস্তান আমলে বর্তমান রাজবাড়ি দ্বীপে নতুন রাজবাড়িটি নির্মিত হয়। নতুন রাঙ্গামাটিতেই এখন চাকমা রাজবাড়ি ও চাকমা সার্কেল চিফের কার্যালয় অবস্থিত যেখানে রাজকার্য পরিচালনা করছেন রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

৭. চাকমা রাজাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িক নীতি

প্রজাবৎসল শাসন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সামাজিক সাম্য ও উদারতা এবং বহু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, বাজার তথা ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ছিল তাদের শাসননীতির অংশ। চাকমা রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাদের রাজপ্রশাসনে যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মর্যাদাপূর্ণ পদে চাকরিতে নিযুক্ত হতেন। এ নীতির ফলে চাকমা শাসনামলে প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিভা প্রদর্শনের অপার সুযোগ লাভ করেছিল হিন্দু, মুসলমান, বড়ুয়া সকলেই। রাজা ত্রিদিব রায়ের স্মৃতিকথায় এমন চিত্র ফুটে উঠেছে: "There is a mention that he (Maharaj Dharam Bux Khan) awarded the title of "Maharaj Battacharjee" to a certain Brahmin priest of Chittagong. Barada Kumar Battacharjee, a direct descendent of the former, took up service as a junior officer of the Chakma Raj during grandfather's time. … Barada Babu also served during my time to a ripe old age and was a great asset because of his wisdom, experience and loyalty (Roy, 2003, p.72)." রানি কালিন্দীর রাজত্বকালে সামাজিক সাম্য ও উদারতা ছিল প্রবাদতুল্য। কালিন্দী রানির এই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অসাম্প্রদায়িক শাসননীতির ঐতিহ্য পরবর্তী শাসকরাও অনুসরণ করেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ রাজা ভূবন মোহন রায়ের রাজ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এমন নজির স্পষ্ট। যেমন পীতাম্বর দাস রাজাফিসের সর্বপ্রধান কর্মচারী, এতদ্ভিন্ন ইংরেজি কেরাণী বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান, আমিন বাবু অধীনচন্দ্র বড়ুয়া,

দ্বিতীয় মোহরের বাবু শুভঙ্কর বড়ুয়া এবং অন্যতম মোহরের বাবু কৃষ্ণকুমার দাসের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ১১১)।

শাসননীতিতে চাকমা রাজাদের এমন ঔদার্য প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ শাসকদের শাশ্বত ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন বাংলার পালবংশ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার খড়্গ, দেব ও চন্দ্র রাজবংশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মতো চাকমা রাজারাও সর্বধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সর্বধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি সমতা, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতা ছিল চাকমা রাজ্যশাসনের মূল মন্ত্র। বর্তমান চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় রাঙ্গুনিয়ার মুসলমান প্রজাদের ধর্মকর্ম প্রতিপালনের সুবিধার্থে মসজিদ নির্মাণের জন্য রাজার হাট বাজারের পাশে ভূমিদান করেছেন এবং যখন তিনি ২০০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন তখন উক্ত দানকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদও তিনি সশরীরে গিয়ে উদ্বোধন করেন (সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ততথ্য)। এভাবে চাকমা রাজারা পরম্পরাগতভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের প্রজাবৎসল শাসনব্যবস্থায় রাঙ্গুনিয়ার সামাজিক পরিমণ্ডলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান রচিত হয়েছিল সকল জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের লেখনীতে এধরনের সামাজিক সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মিলন বিকাশ পাল লিখেছেন, "মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বাঙালী ও উপজাতিসহ সব ধর্মের ও গোত্রের মানুষ এখানে শতাব্দী ধরে একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে (পাল, ২০০৮, পৃ. ৪৮-৪৯)।" রাঙ্গুনিয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ছালেহ আহমদের অভিমতও প্রায় একই। তাঁর মতে 'রাঙ্গুনীয়ায় এককালে চাকমা ও বসতিস্থাপনকারী মুসলিম, হিন্দুদের ক্রমাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে (আহমেদ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩-৪৪)। বিশেষ করে চাকমা রানি কালিন্দীর দানশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সুশাসনের কথা প্রবাদতুল্য। রাজা ত্রিদিব রায়ের স্মৃতিকথায়ও রাণীর প্রতি স্থানীয়দের ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা উঠে এসেছে: "Even today, apart from the Chakmas, the Bengalis of Rangunea recall her name with pride and nostalgia (Roy, 2003, p. 43).' এভাবে চাকমা শাসকরা পরিণত হন চাকমা রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির প্রতীকে। চাকমা প্রজারা রাজাদের প্রতি দেবতুল্য আনুগত্য পোষণ করতেন। সুনীতি ভূষণ কানুনগো যথার্থই লিখেছেন যে 'রাজভক্তি এবং রাজার প্রতি বিশ্বস্ততা চাকমা জনজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য' (কানুনগো, ২০১৬, পৃ. ২৪)।' প্রজারা অবিচল আনুগত্য পোষণ করতো রাজাদের প্রতি আর রাজারা সন্তানের মতো স্নেহবাৎসল্য দিয়ে আগলে রাখতেন প্রজাদের। পাকিস্তান আমলের রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা পূর্বতন রাঙ্গুনিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে রাজাদের সুসম্পর্কের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন: Our family have a traditionally special affection for the people of Chittagong, particularly Rangunea, and I found, they for us. It is like an

old clan tie (Roy, 2003, p. 71). ঠিক তেমনি রাঙ্গুনিয়ার আপামর প্রজাদের রাজভক্তির যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য:

> My first visit to the desolate old Rajbari at Rangunea, … was with my father … perhaps in 1940. Some hours after leaving Rangamati, we disembarked from the motor launch at Ichamati mukh, a few miles short of Chittagong. Our elephants … were there on the riverside and many of the local gentry waited to welcome us. Then in a long procession with young school children shouting slogans of welcome and waving paper flags, we set off, … for the old capital Rajanagar less than three miles inland (Roy, 2003, p.71).

এমন প্রজাবাৎসল্য এবং রাজানুগত্যের পিছনে ছিল রাজাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িক শাসননীতি।

৮. রাঙ্গুনিয়ার চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য নিদর্শন

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো ইমারত। রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজন্যবর্গ রাজ্য, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি করেছিলেন। সেসব এখন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। সর্বাগ্রে উল্লেখ্য চাকমা রাজপ্রাসাদের কথা, ত্রিদিব রায়ের মতে যা ছিল 'a white double storeyed brick house'। চাকমা রাজাদের সাথে মুঘলদের প্রশাসনিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত এ কারণে রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যরীতিতে মুঘল ও ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির সন্নিবেশ বিদ্যমান। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় রাজবাড়ির সামনে একটি স্তম্ভযুক্ত প্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ। দালানটির প্রধান প্রবেশদ্বার দক্ষিণমুখী। আয়তাকার রাজভবনের উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট ২ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ৪৭ ফুট। রাজপ্রাসাদটির নিচতলাটি ছয় কক্ষ বিশিষ্ট। দ্বিতীয় তলাটি কত কক্ষ বিশিষ্ট তা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। কেননা প্রাসাদের ছাদ এবং দোতলার তিনপাশের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। দক্ষিণ দিকের দেয়ালটি এখনো দণ্ডায়মান আছে যেখান থেকে ধারণা করা যায় দোতলায় ন্যূনতম ৫টি কক্ষ ছিল। দোতলায় উঠার জন্য দুটি সিঁড়ি রয়েছে। সম্ভবত অভ্যাগতদের জন্য পূর্বদিকের পৃথক সিঁড়িটি ব্যবহার করা হতো। আর উত্তর-পশ্চিম কোণের সিঁড়িটি অন্দরমহলের বাসিন্দারা ব্যবহার করতেন পর্দা রক্ষার খাতিরে। ভবনটি ইট, সুরকি এবং মর্টার দিয়ে নির্মিত হয়েছে। দরজাগুলোর আকৃতি ধনুকাকৃতি খিলানো। দ্বিতল রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও দেয়ালগুলোর গাত্রালঙ্করণে শ্বেত চুন সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভিতরে অলঙ্করণের নানাবিধ ফুল, খাজকাটা নকশার কারুকাজ দৃশ্যমান। প্রথম তলায় পূর্ব পাশের প্রবেশপথের সংখ্যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচটি; মাঝের খিলানপথটি দু'পাশের দুই খিলানপথের তুলনায় বৃহদাকৃতির এবং খিলানপথগুলোর

উভয়পাশে প্রাচীরোদগত স্তম্ভ (পিলাস্টার) রয়েছে এবং এগুলোতে রয়েছে আয়োনিয় শীর্ষ। খিলানগুলো করবেলিং পদ্ধতিতে নির্মিত। তবে এগুলোর স্প্যানড্রেলে কোনো অলংকরণ ছিল কিনা সেটি আজ আর বুঝার উপায় নাই কিন্তু বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ড নকশার ছাপ কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। প্রাসাদের চার কোণায় বিভিন্ন প্রকার ব্র্যাকেট নকশার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাসাদ-কক্ষগুলোর একটিতে কালের করাল গ্রাসের হাত থেকে টিকে যাওয়া কিছু পলেস্তরায় ফুল লতাপাতার নকশা পরিলক্ষিত হয়। ভবনটির অলংকরণে ও প্রাচীরগাত্রে স্থাপিত স্তম্ভাকৃতির নকশায় কিছুটা ইউরোপীয় বা ঔপনিবেশিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে দৃষ্ট)।

৯. আধুনিক চাকমা সমাজ গঠনে রাজবাড়ির ভূমিকা

এ রাজভবন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজবংশের শাসন, শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে চাকমা সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল রাজবাড়ি থেকে। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠনের পর প্রথম সদরদপ্তর স্থাপন করেছিল রাঙ্গুনিয়ার নিকটবর্তী চন্দ্রঘোনায়। চন্দ্রঘোনা হয়ে ওঠে পার্বত্য অঞ্চলের নয়া শহর। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারের উদ্যোগে চন্দ্রঘোনায় প্রথম 'চন্দ্রঘোনা গভর্নমেন্ট বোর্ডিং স্কুল' নামে পাশ্চাত্যধারার আধুনিক স্কুল স্থাপিত হয়। চাকমা রাজপরিবারের অনেকে এ স্কুলে পড়াশুনা করেন। দেওয়ানদের মধ্যেও অনেকে রাজানগর রা রাজবাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে ভাগ্য বদল করে খ্যাতির শিখরে আরোহন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চাকমা সমাজে দেওয়ানদের অভিজাত বা 'বাবুশ্রেণি' হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে এ রাজবাড়ির বিরাট ভূমিকা ছিল। কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, ত্রিলোচন দেওয়ান, রাজচন্দ্র দেওয়ান রাজবাড়িতে অবস্থান করে চন্দ্রঘোনা স্কুলে পড়াশুনা করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চাকরি লাভ করেন এবং চাকমা সমাজে প্রথম প্রজন্মের সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে জীবিকার নতুন পথ প্রদর্শন করেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ চাকমাদের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের পড়াশুনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান সর্ব্বপ্রথমে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাচীন প্রণালীমতে শিক্ষালাভ করেন। পরে অনুমান ৭/৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজানগর রাজবাটীতে থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্ঠাব্দে চন্দ্রঘোনায় ইংরাজী-বাঙ্গালা মিশ্রিত বিদ্যালয় খোলা হইলে তাহাতে গিয়া ভর্ত্তি হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁকে বাধ্য হইয়া ৪র্থ শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন প্রায় চারিমাস চন্দ্রঘোনার ডেপুটি কমিশনার অফিসে শিক্ষানবিশের কার্য করেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাঁহাকে ৪০ টাকা বেতনে উক্ত অফিসের দ্বিতীয় কেরানী পদে নিযুক্ত করেন (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ১২৩)।

তাছাড়া, রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজা ভূবন মোহন, কুমার রমণী মোহন প্রমুখ রাজকুমারদের জন্মোৎসব, বেড়ে ওঠা, রাজকীয় বিবাহ, রাজ সিংহাসনে আরোহনসহ সকল রাজকীয় কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল রাজভবন। রাজপুন্যাহ, রাজবিহারে ধর্মানুষ্ঠান, মহামুনি মেলা ও রাজকীয় বিবাহোপলক্ষে এখানে আগমন ঘটেছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু জ্ঞানীগুণী, অমাত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। কিন্তু বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িটি বিলীন হওয়ার পথে।

১০. চাকমাদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে রাজন্যবর্গের কৃতিত্ব

রাজবাড়ি সংলগ্ন বৌদ্ধবিহারটি চাকমা জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এ স্থাপনাটির ধর্মীয়, স্থাপত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। চাকমারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তাই বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে চাকমা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ঐতিহ্যও বহু পুরনো। উনিশ শতকে রানি কালিন্দীর শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কথা বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে সুবিদিত। পূর্বে চাকমাদের মধ্যে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। 'লুরি' নামে খ্যাত পুরোহিতগণ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ ছিল আঘরতারা। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন চাকমারা বৌদ্ধধর্ম পালন করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের সামোনা (শ্রামণেরা- রংবস্ত্রধারী প্রব্রজ্জিত ব্যক্তি) ও মোইশাং নামে দু'শ্রেণির পুরোহিত দেখেছেন। তন্মধ্যে মোইশাংদের মর্যাদা উচ্চতর; সমতলের বড়ুয়ারা যাদের 'রাউলিম' বলে সম্বোধন করে (Schendel, 2008, p.108)। চাকমা লুরিদের ধর্মচর্চায় মৌলিক বৌদ্ধধর্মের বিধান অনুসৃত হতো না যা তৎকালীন বার্মা-আরাকান ও শ্রীলংকায় প্রচলিত ছিল। এছাড়া হিন্দুধর্মের অনেক সংস্কার চাকমা সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; বিশেষ করে নানা দেব-দেবীর পূজার্চনা চাকমাদের ধর্মাচারে জায়গা করে নিয়েছিল। বিষয়টি নৃবিজ্ঞানী হার্বার্ট রিজলিরও নজরে এসেছিল। তাই তিনি লিখেছেন:

> The Chakmas profess to be Buddists, but during the last generation or so their practice in matters of religion has been noticeably coloured by contact with the gross Hinduism of Eastern Bengal. This tendency was encouraged by the example of Raja Dharm Baksh Khan and his wife Kalindi Rani, who observed the Hindu festivals, consulted Hind astrologers, kept a Chittagong Brahman to supervise the daily worship of the goddess Kali, and persuaded themselves that they were lineal representatives of the Kshatriya caste. Some years ago, however, a celebrated Phoongyee came from Arakan after the Rajas death to endevour to strengthen the cause of Buddhism and to take the Rani to task for her leanings towards idolatry. His efforts are said to have met

with some success, and the Rani is believed to have fomally proclaimed her adhesion to Buddhism (Risley, 1891, pp.172-173).

রানি কালিন্দী আরাকান থেকে আগত থেরবাদী বৌদ্ধভিক্ষু সারমেধ মহাথেরর উপদেশে চাকমাদের মধ্যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন (মহাস্থবির, ১৯৭৪, পৃ. ১৮)। সারমেধ মহাথেরর বৌদ্ধধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাজপুন্যাহ উৎসবে মহাসমারোহে তাঁকে 'সংঘরাজ' ও 'বিনয়ধর' শিরোনামে রাজকীয় উপাধিকে ভূষিত করেন। অতঃপর সারমেধ মহাথের বৌদ্ধদের নিকট 'সংঘরাজ' নামেই পূজিত হন এবং পণ্ডিত ও জ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মহাথের (মহান থেরবাদী) পদবি গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের লক্ষে রাজানগর রাজবাড়ির সন্নিকটে ১৮৬৬ সালে স্থাপিত হয় শাক্যমুনি বৌদ্ধবিহার। ঐ বিহারে তিনি পরমপূজ্য মহামুনি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলে বিহারটি সাধারণের নিকট মহামুনি মন্দির নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। তবে স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এটি 'নবরত্ন মন্দির' নামেও পরিচিত। ভদন্ত ইন্দাচারা মহাথের ১৯৮৪ সাল থেকে বৌদ্ধ বিহারটির অধ্যক্ষ হিসেবে ধর্মীয় রীতিনীতি পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তাঁর জানামতে, 'তৎকালে অত্রাঞ্চলে বাড়িঘর নির্মাণের কোনো উন্নতমানের প্রযুক্তি ও মিস্ত্রি না থাকায় ব্রহ্মদেশ থেকে সুদক্ষ কারিগর এনে মন্দির নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়। বার্মার তৎকালীন সংঘরাজ সারমেধ মহাথের মন্দির নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)।[১]মন্দির অভ্যন্তরে ভিতরের প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের পাশ ঘেঁষেই একটি ভিক্ষু সীমাঘর স্থাপিত আছে যা এতদঞ্চলের প্রথম পাকা ভিক্ষুসীমা। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কালিন্দী রাণীর আমন্ত্রণে সংঘরাজ[৬] সারমেধ মহাথের আকিয়াব থেকে আরাকানের সারালঙ্কার মহাথেরসহ ২৫ জন বিনয়ধর থের-মহাথের ভিক্ষুসংঘ সহকারে রাজানগরে আগমন করেন (Roy, 2003, p. 39)। রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও আচার্য চন্দ্রমোহন মহাথেরর নিরলস প্রয়াস এবং সারমেধ মহাথেরর উপাধ্যায়ত্বে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর মহামুনি মন্দির পাশে পবিত্র ভিক্ষু সীমা বা 'উপসম্পদা ঘর' স্থাপিত হয়। সারমেধ মহাথের এর নামকরণ করেন চিং। এর আলোকে এই ভিক্ষু সীমা 'স্থল কুল রত্নাংকুর চিং' নামে পরিচিত। এই 'চিং' শব্দটি এখন চাকমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধগণ বিকৃতভাবে 'ঘেং' বলে উচ্চারণ করেন। বলা বাহুল্য, এই 'স্থল কুল রত্নাংকুর চিং' হলো বাংলাদেশের প্রথম বিনয়সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সীমা (মহাস্থবির, ১৯৭৪, পৃ. ২১)। বৌদ্ধ অনুশাসন মতে ভিক্ষুসীমা ছাড়া শিক্ষানবিশ শ্রামণ থেকে ভিক্ষুত্বে উন্নীত হওয়া বা উপসম্পদা লাভ করা যায় না। সুতরাং চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে চাকমা রানি কালিন্দী দেবীর প্রতিষ্ঠিত এ বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষুসীমার সুদুরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। মূল

[৬] উল্লেখ্য রানি কালিন্দী ১৮৫৭ সালে রাজপূন্যাহ দরবারে সারমেধ মহাথেরকে 'সংঘরাজ' উপাধি প্রদান করেন। তখন থেকে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সংঘরাজ নিকায়ের প্রবর্তন হয়।

মন্দিরটিতে ভিক্ষু-শ্রামণ বসবাসের কোনো কক্ষ না থাকায় ভিক্ষু সীমাঘরের উত্তরপাশে ভিক্ষুনিবাস বা বিহার হিসেবে একই আদলে আরেকটি দালান নির্মাণ করা হয়।

রাণীর অপর একটি অভিনব পদক্ষেপ ছিল রাজানগর রাজবিহারে মর্যাদাসূচক 'রাজগুরু' পদবির প্রবর্তন। পাণ্ডিত্য এবং জ্যেষ্ঠতার বিচারে রাজবিহারের 'রাজগুরু' মনোনীত হন (Roy, 2003, p. 71)। স্বয়ং রাজন্যবর্গ কর্তৃক রাজগুরু মনোনয়ন প্রদান এবং রাজবিহারে অবস্থান ও রাজকীয় আনুকুল্য পেয়ে পণ্ডিত ভিক্ষুরাও ধন্য হয়। এ রাজবিহারে প্রথম রাজগুরু নিযুক্ত হন পণ্ডিত সারমধে মহাথের। অতঃপর পরম্পরাক্রমে ভদন্ত পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাথের, ভগবান চন্দ্র মহাথের, ধর্মরত্ন মহাথের, সুমনাজ্যোতি থের থেকে অনেক পণ্ডিত ভিক্ষুগণ রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ভদন্ত ধর্মরত্ন মহাথের ছিলেন ত্রিপিটক বিশারদ। রাজা ত্রিদিব রায় তাঁর আত্মজীবনীতে রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরর কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন যার পৌরহিত্যে তিনি বুদ্ধগয়ায় ক্ষণস্থায়ী শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর বর্ণনায়,

> In the temple we would light candles, hear mantras and sermons from monks, … The last sermon would be from the Ven. Rajguru Dhamaratna Mahathera, Vinayvisarad Tattavaridhi. He was the headmonk of the Rangunea Mahamuni Temple, established by Rani Kalindi. He was … an eloquent speaker and well versed in in the doctrine and canons of the Dhamma. He … became a monk at the permitted age of 20. He studied the Abhidhamma and the Vinaya for many years in Sri Lanka. He was a plains Buddhist, a Barua (Roy, 2003, p. 78).

এভাবে চাকমা রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্মপ্রচার শুরু করলে এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় রাজধর্মে পরিণত হয়। কারণ পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, বোমাং ও মং তিনজন রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ফলশ্রুতিতে সাধারণ প্রজা ও ভক্ত পূজারিদের নিকট 'রাজগুরু ভান্তে' পদবিটি খুবই শ্রদ্ধাষ্পদ এবং মর্যাদাপূর্ণ বলে সমাদৃত হয়।

১১. কালিন্দী রানির মহামুনি বৌদ্ধমেলার প্রবর্তন

চাকমারা উৎসবপ্রিয় নৃগোষ্ঠী। বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে তারা লোকজ ও ধর্মীয় উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন চাকমাদের আটটি উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে বিজু হচ্ছে প্রধান উৎসব। রাজানগর বৌদ্ধবিহারেও বিভিন্ন তিথি ও পূর্ণিমায় ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। রানি কালিন্দী রাজানগর মহামুনি মন্দিরে চাকমাদের বিজু উৎসব উপলক্ষে মহামুনি বৌদ্ধমেলার প্রবর্তন করেন। এখনও প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে চাকমাদের বাৎসরিক বিজু উৎসব উপলক্ষে রাজানগর শাক্যমুনি

রাজবিহারে বৌদ্ধমেলা বসে। হাচিনসন চাকমা ও মগ বা মারমাদের মহামুনি মেলা প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে,

> The Mahamoni is the great festival of the year amongst the Maghs and Chakmas, and marks the close of the year. It is celebrated on Bishu day, the last day of the Maghee year in honour of Buddha Gaudama, and the occasion is seized on to combine business and pleasure and to thoroughly enjoy an *al fresco* picnic of three days duration. … The ceremonial dates fall in the second week of April (Hutchinson, 1906, p. 172).

মেলায় সহস্র মানুষের সমাগম ঘটে। মেলা সপ্তাহ থেকে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রথম তিন দিন বরাদ্দ থাকে পাহাড় থেকে আগত দর্শনার্থীদের জন্য। সতীশ চন্দ্র ঘোষের চাকমা জাতি গ্রন্থেও চাকমাদের মহামুনি মেলার চিত্র প্রতিভাত হয়। তিনি লিখেছেন: চাকমা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রায় সকলেই সেই সুদূর মহামুনি নিদর্শনে গমন করে। "ফুল বিষু" অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্ব দিন হইতে ইহাদের তীর্থকার্য আরম্ভ হয়। প্রথমে স্নানাদিতে শুচি হইয়া মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত বারান্দায় বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ঘুরিয়া আকুলপ্রাণে বুদ্ধনাম কীর্তন করিতে থাকে। এরূপে কিছুকাল প্রদক্ষিণের পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মহামুনির শ্রীচরণপ্রান্তে উপচার-থালা এবং প্রজ্বলিত বর্তিকা স্থাপন করত: ভূমিগত প্রণিপাত করে (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ১৫২)।'

উনিশ শতকে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর এবং রাউজানের মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে দুই জায়গাতে বৌদ্ধ মেলা বসত। পাহাড়তলীর কদলপুর গ্রামে অবস্থিত মহামুনি মন্দিরটি মানিকছড়ির মং রাজাদের নির্মিত। রাজানগর মহামুনি মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে সেখানে মেলা বসতো। চাকমারা উভয় মেলাতে অংশগ্রহণ করতো তবে রাজানগরে মহামুনি মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় মেলা শুরু হলে চাকমারা সে-মেলাতে অংশগ্রহণে বেশি উচ্ছ্বসিত থাকত। আর এইচ এস হাচিনসন মহামুনি মেলাকে চাকমা ও মারমাসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' উৎসব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন পাড়া গ্রাম থেকে দলে দলে মেলায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

> As the days of the festival approach crowds of Maghs and Chakmas in village parties, numbering from five to twenty or even more, may be met on road and river. They are a jovial throng, free from care, decked in holiday attire, and brimful of glee and laughter. The fatigues of the journey are unheeded in the round of light chaff, song and dance with which they beguile the tedium of the way. A drummer leads the procession, cheering any flagging spirit with a vigorous

tattoo and … while every few minutes the party will, … give forth in unisong the "hoya," or hill cry (Hutchinson, 1906, p.172).

বিশিষ্ট চাকমা লেখক শরদিন্দু শেখর চাকমা মহামুনি মেলা প্রসঙ্গে লিখছেন: "তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা হতে শত শত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী মা-বাবার সঙ্গে, মধ্য বয়সী মেয়ে পুরুষ, অনেক সময় বয়স্করা পর্যন্ত কেহ রাজানগর মহামুণি মেলায়, কেহ-বা পাহাড়তুলী মহামুণি মেলায়, কেহ-বা উভয় মেলায় অংশগ্রহণ করত। তারা মন্দিরে প্রার্থনা করত, বাতি জ্বালাতো, মন্দিরের চারিদিকে হৈ হুল্লোড় করে নেচে বেড়াতো (চাকমা, ২০০৬, পৃ. ১৫)।" হরিলাল সাহা লিখেছেন, 'রাজাভূবনের বৌদ্ধবিহার তেমনি একটি পূণ্যস্থান। এ বৌদ্ধবিহারে বিশেষ বিশেষ তিথি, বিশেষত: চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম ঘটে। ছোট বেলায় মনে পড়ে এ বিহারে স্থাপিত ভগবান বুদ্ধের বিশাল প্রতিমূর্তির চারিদিকে দলবদ্ধ হয়ে ভক্তি নম্র চিত্তে ঘুরে ঘুরে ভগবানের কৃপা মেগেছে '(সাহা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩-৫১)।

এসব বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে রানি কালিন্দীর প্রবর্তিত বৌদ্ধমেলা চাকমা লোকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ কথা সত্য যে লোকজ মেলা ও উৎসবসমূহ বাংলার চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। উৎসবগুলো সকল সম্প্রদায়ের জন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়। রাঙ্গুনিয়ার চাকমা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মহামুনি বৌদ্ধ মেলা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

১২. কাছারি দালান: চাকমা রাজ কার্যালয়ের আদিরূপ

চাকমা রাজপ্রশাসনের সাথে কাছারি ঘর বা রাজকার্যালয় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি ছিল রাজাদের খাজনা আদায়, বিচারকাজ পরিচালনা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। রাজপূন্যাহ অনুষ্ঠানের সময় এ ভবনে দরবার বসতো। এখানে রাজ পূন্যাহকে কেন্দ্র করে রাজার অধীনস্ত মন্ত্রী, উপদেষ্টা, দেওয়ান, তালুকদার, খীসা-কার্বারী, সাধারণ প্রজাকুল ও দর্শনার্থীসমেত সহস্র লোকের সমাগম হতো। চাকমা রাজসরকারের প্রশাসনিক কাজ এই কাছারি ঘরে সম্পাদিত হতো। রাঙ্গুনিয়ার রাজবাড়ি সংলগ্ন একটি কাছারি দালান এখনো টিকে আছে। এটি ইউরোপীয় নির্মাণশৈলীতে নির্মিত। চট্টগ্রামের কোর্ট বিল্ডিং এর বহিরাঙ্গনের সাথে এ দালানের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট এবং প্রস্থ ২৪ ফুট বিশিষ্ট কাছারি দালানটি পূর্বমুখী। সম্মুখভাগে সাতটি দরজা আছে। বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে আগত প্রজাদের চলাচলের সুবিধার্থে দালানে খোলামেলা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিতরের চৌকোণাকৃতির দুটি স্তম্ভ/পিলারের উপর লোহার বিম দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাঙ্গামাটির বর্তমান চাকমা রাজবাড়ি সংলগ্ন চাকমা সার্কেল চিফ কার্যালয় আধুনিক স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩. চাকমা রাজন্যবর্গের সমাধিসৌধ

চাকমারা মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করে। তবে রাজপরিবার, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুরু বা সমাজের কোনো প্রতাপশালী ব্যক্তি পরলোক গমন করলে তাঁদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে থাকে। এ রীতির প্রবর্তনও রাজপরিবারের মধ্যে প্রথম দেখা যায় এবং রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজবাড়ির সংলগ্ন স্থানে রাজা ধরম বক্স খাঁ ও রানি কালিন্দীর স্মরণে নির্মিত দুটি সমাধি সৌধই চাকমা ইতিহাসে প্রথম পাকা সমাধি সৌধ। সতীশ চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'অবশেষে যথাসময়ে মহামুনি মন্দির ও ক্যং ভবনের মধ্যভাগে চন্দনকাষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ ঘৃত সহযোগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইল (ঘোষ, ২০১০, পৃ. ৮৯)।' রানি কালিন্দীর সমাধিসৌধে একটি প্রস্তর লিপি আছে। ফলকটি ১৯১০ সালের ১ জানুয়ারিতে রাজা ভূবন মোহন রায় কর্তৃক স্থাপিত হয়। রাঙ্গামাটি রাজবাড়ি এলাকায় রাজা ভূবন মোহন রায় এবং নলিনাক্ষ রায়ের ভাস্কর্য যেমন আছে তেমনি রাঙ্গামাটির রাজবিহারের রাজগুরু ভদন্ত অগ্রবংশ মহাথের ও রানি বিনীতা রায়ের স্মৃতিসৌধও আছে।

গবেষণায় যা উঠে এসেছে : (১) আঠারো শতকের ত্রিশের দশকে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন শেরমুস্ত খাঁ। তিনি রাঙ্গুনিয়ায় চাকমাদের 'ভাগ্য নিমার্তা'। তাঁর সময় থেকে রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় পর্যন্ত মোট এগারো জন রাজা বংশানুক্রমে প্রায় দেড়শত বছর রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসন পরিচালনা করেন। (২) আঠারো শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চাকমা রাজারা ব্রিটিশদের অন্যায় রাজস্বনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এর ফলস্বরূপ জানবক্স খাঁ পার্বত্য এলাকার 'প্রকৃত রাজা' হিসেবে ব্রিটিশদের স্বীকৃতি লাভ করেন। (৩) জানবক্স খাঁর শাসনামলে ইছামতি নদীর তীরে গড়ে ওঠে চাকমা রাজধানী রাজানগর ; পরবর্তী রাজাদের সময় এর ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং চাকমা শাসিত অঞ্চলের সীমানা গহীন পার্বত্য এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। (৪) চাকমা রাজাদের শাসন নীতি ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। (৫) রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থানকালে চাকমাদের সামাজিক স্তরবিন্যাস সুদৃঢ় হয় এবং ধর্মাচার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সংস্কার ও রূপান্তর ঘটে। (৬) চাকমা রাজন্যবর্গের প্রতি জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয়দের ভক্তি ও আনুগত্য ছিল প্রবাদতুল্য। (৭) রানি কালিন্দীর শাসনামলে ব্রিটিশদের ট্রাইবেল নীতিতে পরিবর্তন আসে এবং পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে তারা চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস নামে পৃথক জেলা গঠন করে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। (৮) রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার অতিরিক্ত বাঙালি সংস্রবের অভিযোগ আনে এবং রাজাকে রাজানগর পরিত্যাগ করে রাঙ্গামাটিতে থিতু হতে বাধ্য করে। (৯) কিন্তু রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনের ঐতিহ্য নিদর্শনসমূহ এবং চাকমা রাজ এস্টেট এর ভূসম্পত্তি এখনো রাজাদের স্বত্বাধিকারে রয়ে

গেছে এবং আঠারো ও উনিশ শতকের চাকমা শাসন বিশেষ করে রানি কালিন্দী ও তাঁর যুগ রাঙ্গুনিয়ার স্থানীয় ইতিহাস ও জনমানসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে চাকমা ইতিহাসের একটি অজানা ও অনালোচিত অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে যা চাকমা জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা অনুধাবন ও মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

১৪. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসনকাল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজাদের নেতৃত্বে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়েছিল। ১৭৩৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর ধরে চাকমা শাসকবর্গ রাঙ্গুনিয়া থেকে স্বশাসন পরিচালনা করে। রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর তাদের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও চাকমা শাসিত অঞ্চলের সীমানা পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলোর শাসনভার ছিল দেওয়ানদের ওপর ন্যস্ত। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা শেরমস্ত খাঁ যখন আরাকান থেকে রাঙ্গুনিয়ায় আগমন করেন তখন বাংলায় ছিল নবাবী আমল। স্বাভাবিকভাবে চাকমা রাজপ্রশাসনের বুনিয়াদ গঠনে নবাবী আমলের প্রভাব পড়েছিল। নবাবী শাসনে শীর্ষ বেসামরিক কর্মকর্তার পদবি ছিলো দিউয়ান বা দেওয়ান। চাকমা রাজ্য শাসনে দেওয়ান পদবির প্রচলন বাংলার নবাবী শাসন ব্যবস্থার প্রভাবের ফল। এভাবে ১৭৩৭-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুইযুগ ধরে নবাব সরকারের চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিনিধি তথা ফৌজদারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চাকমা রাজারা রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে নিজের ক্ষমতা ও অবস্থান সুসংহত করে নেয়। অতঃপর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার শাসনভার নবাব সরকার থেকে কোম্পানি সরকারের নিকট হস্তগত হয়। এ পর্বে চাকমারা ব্রিটিশ শাসকদের প্রভাবাধীনে চলে আসে। কিন্তু হ্যারি ভ্যারেলস্টের মতো ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকদের কার্যকালে রাঙ্গুনিয়ার চাকমারা স্বাধীনভাবে স্বরাজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হলেও পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী ও পুরোদমে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রশাসকদের সময় চাকমা রাজাদের ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রভাব ও এখতিয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়। এভাবে রচিত হয় চাকমাদের ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের পটভূমি যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। একদশক পর কোম্পানি সরকার ও চাকমা নেতাদের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং এর ফলে রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজা জান বক্স খাঁ স্বীয় জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃত শাসকের স্বীকৃতি লাভ করেন। এভাবে রাঙ্গুনিয়ার চাকমারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে কোম্পানি শাসনের সূচনাপর্বে বাৎসরিক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা পরিশোধের বিনিময়ে স্বশাসন পরিচালনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নিজস্ব পরিসীমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজারা ছিলেন সর্বেসর্বা। চাকমাদের ইতিহাসে এটি ছিল একটি বড় মাইলফলক। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রাঙ্গুনিয়ায় রাজানগর চাকমা রাজন্যবর্গের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজানগরে রাজা ধরম বক্স খাঁ ও তাঁর রাজমহিষী রানি কালিন্দীর সময়ে রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা শাসন বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভ করে। রাজকীয় পূন্যাহ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব বৌদ্ধমেলার সূচনাও হয় রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে। সমাজ গঠন ও বিকাশে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ উপলব্ধি চাকমা শাসকদের মধ্যে ছিল। তাঁদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদার সামাজিক নীতির কারণে রাঙ্গুনিয়ায় সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। চাকমা রাজসরকারে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতানুসারে কর্মে নিযুক্তি লাভ করে। রাজার হাট, রাণীর হাট, ধামাইর হাট নামে বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র এবং বাজার স্থাপনের কারণে রাঙ্গুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। কালিন্দী রানির ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রানি কালিন্দীর সময় চাকমা শাসিত পার্বত্য অঞ্চলে সরসারি ব্রিটিশ রাজের শাসন চালু হয়। অতঃপর চাকমা রাজন্যবর্গও ব্রিটিশ আইন-কানুনের আওতাভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রণীত আইনবলে নবসৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগ ও পদায়ন করলে পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা রাজাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ হ্রাস পায়। তবুও সিপাহী বিদ্রোহ দমন ও লুসাই অভিযানে রানি কালিন্দী সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর চিরায়ত ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার ক্ষুণ্ন হয় এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ান। একারণে স্থানীয় প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইনের সাথে রানির সম্পর্ক মারাত্মক বৈরিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পরবর্তী চাকমা শাসন ব্যবস্থায়। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত লুসাই অভিযানে অংশগ্রহণ করে রানির উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ শাসকদের সুনজর লাভ করেন। রাজা হরিশচন্দ্রের সময় ক্যাপ্টেন লুইন পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৭ টি সার্কেলে বিভক্তির সুপারিশ করেন যাতে চাকমা শাসিত অঞ্চল খণ্ডবিখণ্ড হবার উপক্রম হয়। হরিশ্চন্দ্র এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্থানীয় প্রশাসকদের তথা ব্রিটিশ-সরকারের রোষানলে পড়েন। কিন্তু সার্কেল ব্যবস্থা রোধ করা যায়নি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সেটা কার্যকর হয়। নতুন ব্যবস্থায় সংকুচিত হয়ে পড়ে চাকমা শাসিত অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা। অবশেষে উনিশ শতকের শেষপাদে ঔপনিবেশিক শাসকদের চাপে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে শতবছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর জন্মভূমি ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হতে হয়। এভাবে সমাপ্তি ঘটে একটি অধ্যায়ের। রাজা ভূবন মোহন রায়ের রাজত্বকালে রাঙ্গামাটিতে নির্মিত হয় দৃষ্টিনন্দন নতুন রাজবাড়ি। শুরু হয় চাকমাদের রাঙ্গামাটিকেন্দ্রিক নতুন ইতিহাস। কিন্তু রাঙ্গুনিয়ায় প্রায় দেড়শত বছরব্যাপী চাকমা শাসনের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে রাজানগর চাকমা রাজবাড়ি, শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, রাজাভূবন উচ্চ বিদ্যালয় এবং কালিন্দী রাণির স্মৃতিবিজড়িত রাণীর হাট বাজার ও রানি কালিন্দী দেবী সড়ক।

তথ্য নির্দেশ

"ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা বেশি" *প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০২২

Lewin, Capt. T. H. (1869a). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein*, Bengal Printing Company Ltd.

Islam, S. (Ed.). (1978). *Bangladesh District Record: Chittagong: Vol. 1(1760-1787),* University of Dhaka.

Lewin, Capt. T. H. (1869a). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein*. Bengal Printing Company Ltd.

Lewin, Capt. T. H. (1870b). *Wild Races of South-Eastern India*. W. H. Allen & Co.

Lewin, Capt.T. H. (1912c). *A Fly on the Wheel or How I helped to Govern India*. Constable & Company Ltd.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০১৬). আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০১৬). আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০০৬). সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *জাতীয় সংস্কৃতি নীতি*, [বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, নভেম্বর ২৯, তারিখে প্রকাশিত] ঢাকা, বাংলাদেশ।

আলম, মাহ্‌বুব-উল্, (১৯৬৫), *চট্টগ্রামের ইতিহাস* [পুরানা আমল] ৪র্থ মুদ্রণ, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

চৌধুরী, আবদুল হক, (১৯৮০), *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, জোবাইদা বানু কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম।

শরীফ, আহমদ (২০১১), *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ১ম প্র. ২০০১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ।

আলম, ওহীদুল, (১৯৮২), *চট্টগ্রামের ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল*, আলমবাগ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম ।

চৌধুরী, আবদুল হক, (১৯৮০), *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম।

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ, (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ), "চট্টগ্রামে মঘ শাসন" *ইতিহাস পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮৭-৯২।

বড়ুয়া, সুনীতি রঞ্জন (১৯৮৪), *রাঙ্গুনিয়ার ইতিবৃত্ত*, ময়নামতি আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম।

লোফলার, লরেন্স, জি. (১৯৬৪), "চাকমা এন্ড সাক" উদ্ধৃত - ভলফ গ্যাং মে, *পার্বত্য চট্টগ্রামে কৌম সমাজ*, কলিকাতা।

কামাল, মেসবাহ ও অন্যান্য (সম্পা.), (২০০৭). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

Hosten, H. (1920). "Jesuit Letters from Bengal, Arakan & Burma (1599-1600)"; *Bengal Past and Present,* Vol. 30. Part 1, 61-62.

রায়, অসীম কুমার (১৯৫৬), *বঙ্গবৃত্তান্ত: বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা* কলকাতা, খদ্ধি ইন্ডিয়া।

Hutchisons, R. H. S. (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tracts*. The Bengal Secretariat Book Depot.

Serajuddin, A. M. (1984). "The Chakma Tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18th Century" in the *Journal of the Royal Asiatice Society of the Great Britain and Irreland*, (1):90-98.

Serajuddin, A. M. (1971). *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong, 1761-1785,* University of Chittagong.

বড়ুয়া, বিপ্রদাশ (সম্পা.), (২০০৫), *শ্রীমাধবচন্দ্র চাকমা কর্ম্মীর শ্রীশ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস*, নবযুগ প্রকাশনী (১ম প্র. ১৯৪০), ঢাকা।

Govt. of Bengal. (1869). Resolution. Political. Dated Fort William, the 20th November, *List of Correspondence Regarding Chakma Raj of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong.*

ইসলাম, সিরাজুল, (২০১২). "পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ" আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *মুক্তির সংগ্রাম*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা।

Islam, S. (Ed.). (1978). *Bangladesh District Record (1760-1787), Chittagong: Vol. 1,* University of Dhaka.

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ, (২০১৬), *ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৭২-১৭৯৮)*, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি।

Islam, S. (2018). "Protest Movements and Insurgencies in the eighteenth and nineteenth centuries" in Islam, Serajul. (Ed.). *History of Bangladesh 1704-1971*. Asiatic Society of Bangladesh.

Mackenzie, A. (1884). *History of the Relations of the Government wtith the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal.* The Home Department Press.

Schendel, W. van. (Ed.) (2008). *Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798*): *His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla,* 2nd imp. The University Press Ltd.

Roy, R. T. (2003). *The Departed Melody*. PPA Publications.

হাসন, মোহাম্মদ, (১৯৯৭), "রাঙ্গুনীয়ার ইতিকথা" ডাঃ ফজলুর রহমান, (সম্পা.), *রাঙ্গুনীয়া স্মরণিকা*।

Qanungo, S. B. (1998). *Chakma Resistance to British Domination1772-1798*. published by the author.

Hunter, W. W. (1973). *A Statistical Account of Bengal Repnt.*, Vol. 6. D. K. Publishing House.

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র, (২০১০), *চাকমা জাতি: জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত*, অরুণা প্রকাশন সং. কলকাতা।

বাহাদুর, মৌলভি হামিদুল্লাহ্ খান, (২০১৩), *আহাদিসুল খাওয়ানিন: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

দেওয়ান, বিরাজ মোহন, (২০০৫), *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, উদয় শংকর দেওয়ান প্রকাশিত, ২য় সং, রাঙ্গমাটি।

দেওয়ান, শ্রীকামিনী মোহন, (১৯৭০), *পার্ব্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, রাঙ্গামাটি।

Hutchinson, R. H. S. (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tracts*. The Bengal Secretariat Book Depot.

বড়ুয়া, বিপ্রদাশ ও বড়ুয়া, দিলীপ কুমার, (সম্পা.) (২০০৫), *বৌদ্ধ-রঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম-গ্রন্থ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

Wangza, D. (2003). "Kalindi: The Chakma Queen" in *Chakma Rajpunyah 2003,*41-48.

From Major J. M. Graham. (1871), Officiating Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts, to the Secretary to the Government of Bengal; No. 39, dated Rungamuttee, 5th Februay 1871. In Accounts and Papers of the House of Commons, Great Britain Parliament House of Commons, Thirty-six volumes, Session 6 February–10 August 1872.

Letter No. 1937-- P. From the Under-Secretary to the Government of India (Foreign Department) to the Offg. Secretary to the Government of Bengal in the Judicial Department Dated Simla, the 12th September 1872 documents available at Chakma Raja's Archives, Rangmati.

পাল, মিলন বিকাশ, (২০০৮), "রাঙ্গুনীয়া উপজেলা পরিচিতি" মোঃ আসলাম খান (সম্পা.), *কর্ণফুলীর বাঁকে* রাঙ্গুনিয়া থানা কমিউনিটি পুলিশিং, রাঙ্গুনিয়া।

আহমেদ, মোঃ ছালেহ, (১৯৯৭), "রাঙ্গুনিয়ার ঘরোয়া রাজনৈতিক বিকাশ" মোঃ আসলাম খান (সম্পা.), *কর্ণফুলীর বাঁকে* ।

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ, (২০১৬), *ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৭২-১৯৮)*

Risley, H. H. (1998). *The Tribes and Caste of Bengal (repnt.).* Firma KLM Private Limited.

মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, (১৯৭৪), *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা।

সাক্ষাৎকার: ভদন্ত ইন্দাচারা মহাথের, অধ্যক্ষ, রাজানগর শাক্যমুনি রাজবিহার, স্থান-রাজবিহার, তাং-০২/১০/২০২০।

Roy, R. T. (2003). *The Departed Melody.* PPA Publications.

Hutchinson, R. H. S. (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tracts*. The Bengal Secretariat Book Depot.

চাকমা, শরদিন্দু শেখর, (২০০৬), *পার্বত্য চট্টগ্রামের মেলা উৎসব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

সাহা, হরিলাল, (১৯৯৭), "আমার ছোট বেলার রাঙ্গুনীয়া" *রাঙ্গুনীয়া স্মরণিকা*।

কানুনগো, ড. কালিকারঞ্জন, (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), " পাদ্রী ম্যানরিকের আরাকান যাত্রা" *পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা।